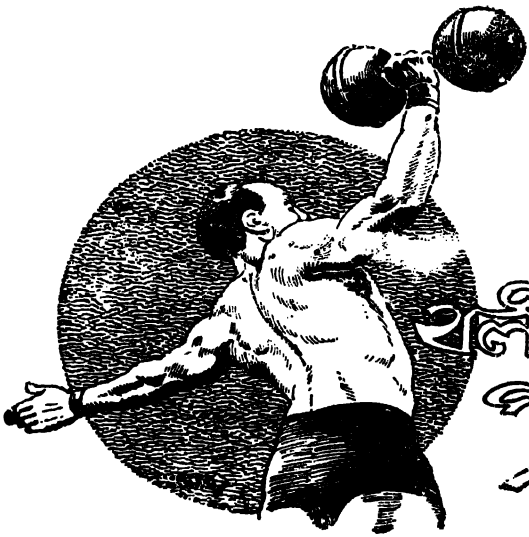

শচীন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
এস, সি, মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

আশ্বিন
১৩৫৭

ছেপেছেন—
এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মল্ল-শ্রেষ্ঠ, বিদেশে প্রথম স্বীকৃত ভারতীয় মল্ল,
পৃথিবীর ভূতপূর্ব্ব লাইট-হেভি চ্যাম্পিয়ন, বাল্যবন্ধু
গোবরবাবুকে দিলাম।

এই লেখকের লেখা বই

ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম,
হারানো দিন, পথের
বন্ধু প্রভৃতি।

ভূমিকা

আমাদের এই বিরাট্ দেশে বড় বা ছোট বলীদের সংখ্যা করা যায় না। সকলের বিষয়ে লেখা কোনও একজন লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যাদের চোখে দেখেছি কিংবা যাদের কৃতিত্বের প্রমাণ নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে করি, তাদের কথাই এই বইটিতে লিখেছি। পাঠক যেন মনে না করেন যে, আমি অপর গুণী ব্যক্তিদের অবহেলা করেছি। শক্তিমান্ পুরুষদের বিষয় প্রবাদ এত বেশী ছড়িয়ে পড়ে যে, ব্যক্তিগত জ্ঞান ভিন্ন সে আলোচনা করা বিপজ্জনক। কোথাও কোথাও আমি যে-সকল মত প্রকাশ করেছি, তা আমার ব্যক্তিগত মত।

বাংলা দেশে এখন শক্তিচর্চ্চার আদর হতে আরম্ভ হয়েছে। আশা করা যায়, এই ছোট বইটিও পাঠকসমাজে আদৃত হবে।

বহুকাল ধ'রে অসংখ্য লোকের কাছ থেকে আমি নানা সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব কথা। আমাকে যাঁরা ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে গোবরবাবু, বেজওয়াডার শ্রীযুক্ত কোলি রঙ্গদাস চৌধুরী, ক্রেমারের ম্যানেজার ফেলীনো কোয়াগ্লিয়া, বিদেশী মল্ল জর্জ্জ কন্সট্যান্টাইন্ ও জিবিস্কো ম্যালিনোভিচ্, আব্দুল সালাম, এ. মাইকেল ও শ্রীযুক্ত সৌরেন বসু

প্রধান। আরো অনেকে আমাকে ছবি ব্যবহার করতে দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও তাড়াতাড়ির জন্য বইটিতে কিছু প্রুফের ভুল পেলে, মার্জ্জনা করবেন আশা করি।

'সিল্‌ভরওক্‌স্'
ল্যুকর রোড, এলাহাবাদ
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

শচীন্দ্র মজুমদার

উপহার

ব'সে ডানদিক্ থেকে : গামা, শচীন্দ্র মজুমদার, ইমাম বখস্
দাঁড়িয়ে : হামিদা ও ছোট গামা

বলীদের গল্প

এক

খেলোয়াড় আর শক্তিশালী পুরুষের দল আপনি আমার পথে এসে পড়েছে। এই ব্যাপার আরম্ভ যখন হয় তখন আমার বয়স অত্যন্ত অল্প। আমরা তখন কলিকাতায় থাকি। এক সন্ধ্যায় কেউ আমাকে ঝামাপুকুরে রাজ দিগম্বর মিত্রের বাড়ী নিয়ে যান, শ্যামাকান্তের খেলা দেখাবার জন্য। শ্যামাকান্তের এই খেলার দুটি বিষয় আমার মনে আছে। তিনি সেদিন ইংরেজি কাপড় পরেছিলেন। একটা চেয়ারে মাথা ও অন্য-একটায় পায়ের গোড়ালি রেখে, দেহ তক্তার মত শক্ত ক'রে তিনি শুয়ে রইলেন, তাঁর বুকের ওপর খুব বড় একটা পাথর চাপিয়ে সেটাকে ভাঙ্গা হ'ল। পরে আমি এ ধরণের খেলা বহু লোককে করতে দেখেছি। তারপর শ্যামাকান্ত একটা বিরাট বাঘের খাঁচায় একটা টেরিয়র কুকুর সঙ্গে ক'রে প্রবেশ করলেন। বৃহৎকায় ব্যাঘ্রটির সঙ্গে নানা কসরৎ ক'রে এই অসীম সাহসী পুরুষ দু'হাতে বাঘের চোয়াল ফাঁক ক'রে নিজের মাথা সেই মৃত্যু-গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

শ্যামাকান্ত তখন থাকতেন কালীতলার একটা বাড়ীতে। আমি তখন আর্য্যমিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমার সহপাঠী মন্মথ,

শ্যামাকান্তের বাড়ীর পাশে থাকত। তার সঙ্গে প্রত্যহ তিনটি বাঘ দেখতে যাওয়া আমার দৈনিক কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিল। প্রতিদিন দেখতাম, শ্যামাকান্ত একটা বেতের মোড়ায় ব'সে সংবাদপত্র পড়ছেন।

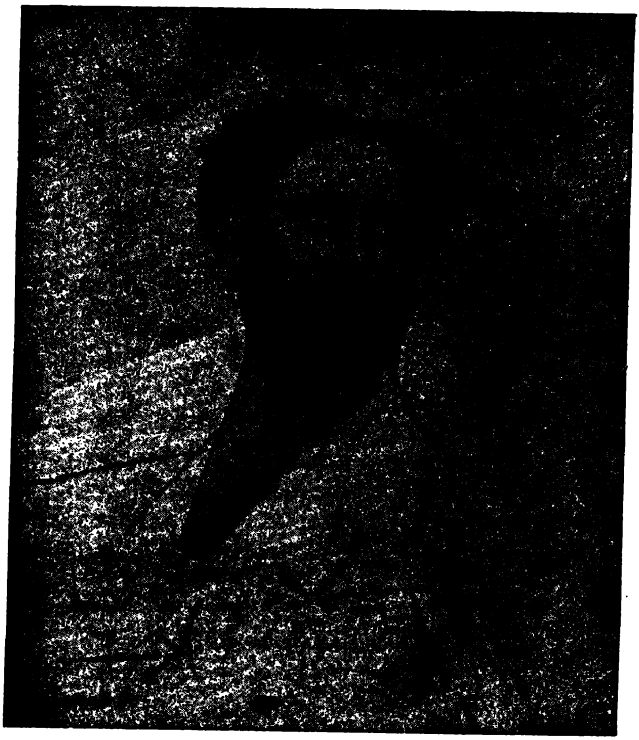

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর চৌকো চোয়াল, কোঁকড়া চুল এবং বিরাট দুটি বাহু আজও মনে হয় স্পষ্ট দেখতে পাই। কোনোদিন এই বিক্রমশালী পুরুষের সঙ্গে আমার কথা কইবার সুযোগ হয়নি। একদিন অত্যন্ত কৌতূহলী

হয়ে নিদ্রিত একটা চিতার থাবায় পেন্সিলের খোঁচা দিয়ে তার মেজাজ পরীক্ষা করছিলাম, কানে টান পড়ায় পিছন ফিরে ভীষণতর মানব-ব্যাঘ্রকে দেখলাম। সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তকে যখন আমি এই ঘটনার বহুকাল পরে দেখি, তখন তাঁর দেহ স্থূল ও শিথিল হয়ে গেছে।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার নবযুগের এক বিশিষ্ট শক্তিশালী পুরুষ বলা যায়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের ব্যায়ামের নবযুগের প্রবর্ত্তক অম্বুবাবুর কোন কথা আমি জানি না, কাজেই তখনকার অন্য কোন বলশালী ব্যক্তির সঙ্গে শ্যামাকান্তের তুলনা করা যায় না। তাঁর সাহস ছিল অতুলনীয়, দেহ-সৌষ্ঠব ছিল চমৎকার, কিন্তু তিনি আজকালকার বাঙালী বলীদের চেয়ে অধিকতর বলবান ছিলেন কি না এ-কথা বলা অত্যন্ত শক্ত।

আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক বলবানের মনে স্পোর্টিং-স্পিরিট থাকে এবং শ্যামাকান্তের মনেও তা ছিল। কোন এক লেখক শ্যামাকান্তের সুখ্যাতি করতে গিয়ে তাঁর প্রতি যথেষ্ট অন্যায় করেছেন। এই লেখকের লেখা 'বাঙালীর বল' পুস্তকে বর্ণনা আছে যে, একদা কোন সার্কাসের ইংরেজ-মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে শ্যামাকান্ত তার তলপেটে ঘুসি মেরে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছিলেন এবং তাতে দর্শকেরা আপত্তি করলে, শ্যামাকান্ত কথার বাহাদুরি দেখিয়েছিলেন। শ্যামাকান্ত বলী কুস্তিগীর ছিলেন, মুষ্টিযুদ্ধ তিনি জানতেন কিনা বলতে পারি না, তবে এই বর্ণনার কিছুও যদি সত্য হয়, আমরা ধরে নিতে পারি যে, শ্যামাকান্ত মুষ্টিযুদ্ধের নিয়ম-কানুনের বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। তোমরা জান যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মুষ্টিযোদ্ধা কখনো

প্রতিযোগীর কোমরের নীচে ঘুসি মারবে না। শ্যামাকান্তের বিষয়ে এ গল্প তোমাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করি।

কিছুকাল পরে আমি ভুবনবিখ্যাত ইউজীন স্যাণ্ডোকে দেখি, বোধ হয় করিন্থিয়ন থিয়েটারে। একটা ঘূর্ণায়মান টুলের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি নিজের অপরাভূত দেহ-সৌষ্ঠব দেখাচ্ছিলেন। আমার এখন কেবল স্যাণ্ডোর দক্ষিণ বাহু ও পিঠের কতকটা অংশ মনে আছে, আর মনে আছে তাঁর কয়েক প্যাকেট তাস ছেঁড়ার কথা। সে সময়ে তার বিরাট দেহের প্রত্যেকটি পেশী আকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

আমার পিতা এই সময়ে উত্তর চীন থেকে কানপুরে বদলী হয়ে আসেন, ও আমরা সকলে সেখানে এসে বাস করতে আরম্ভ করি। ইতিপূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার নানা স্থানে ব্যায়ামাগার স্থাপিত হতে আরম্ভ হয় এবং আরো পাঁচজন বালকের মত আমিও ব্যায়াম করতে আরম্ভ করি, যদিও সে সময়ে আমি একসঙ্গে এবং শুদ্ধভাবে দুটো 'ডন'ও দিতে পারতুম না। কানপুরে বহুকাল থেকে এক বিখ্যাত বাঙালী-ব্যায়ামাগার আছে। তখনকার দিনে এই শহরের বাঙালী যুবকদের ভেতর খেলা ও ব্যায়ামের খুব সখ ছিল এবং বাঙালী-সমাজে নামজাদা ফুটবল, ক্রিকেট-খেলোয়াড় এবং জিমনাস্টের প্রাচুর্য্য ছিল। আমিও ব্যায়ামাগারে ভর্ত্তি হই এবং আমাকে আকর্ষণ করেন তখনকার বিখ্যাত জিমনাষ্ট পান্নালাল চক্রবর্ত্তী। এমন কোন ব্যায়াম ছিল না, যাতে পান্নার বিপুল দক্ষতা না ছিল। পরিণত বয়সেও আমি পান্নার মত সুদক্ষ হরাইজণ্টাল

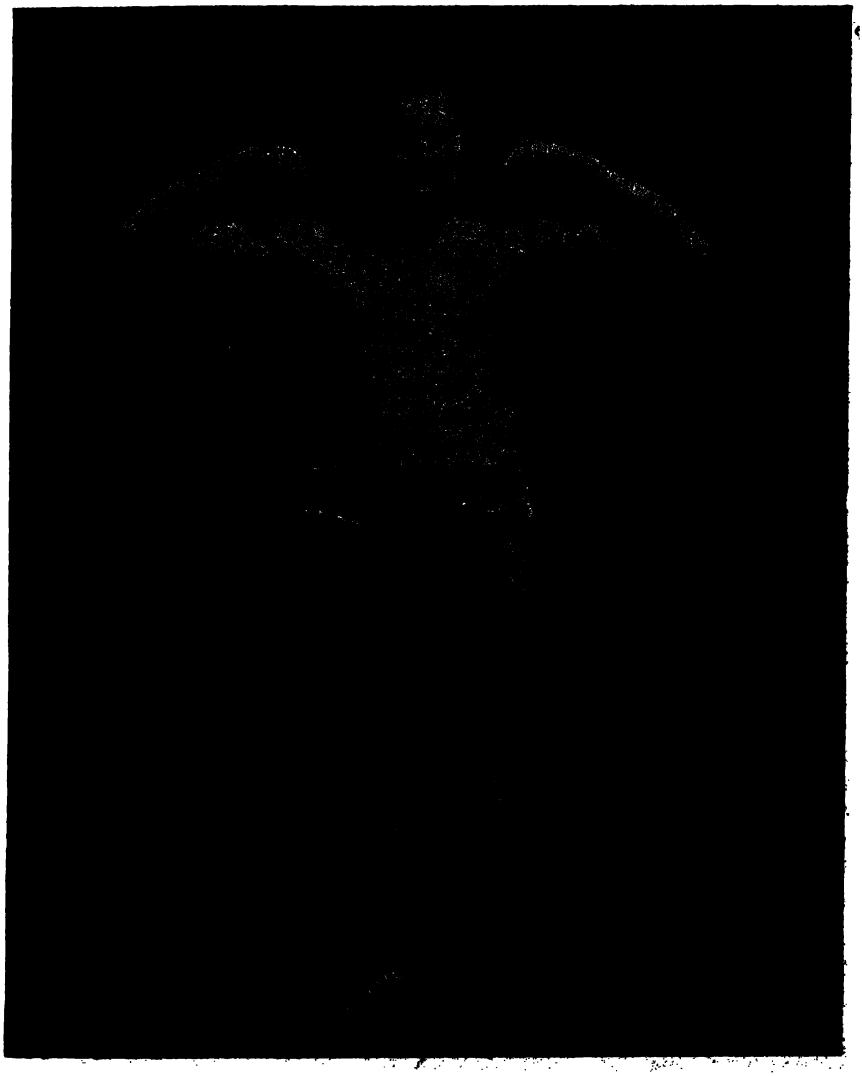

ভুবনবিখ্যাত স্যাণ্ডো

বার-প্লেয়ার দেখিনি। তখনকার দিনে যুক্তপ্রদেশে (বর্ত্তমান উত্তর-প্রদেশে) স্কুল টুর্ণামেণ্টের প্রথা ছিল। এতবড় প্রদেশে একটা টুর্ণামেণ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না, কাজেই নানা বিভাগীয় কেন্দ্রে এই টুর্ণামেণ্ট হ'ত। এখনকার অলিম্পিক টুর্ণামেণ্টের চেয়েও এই টুর্ণামেণ্টগুলি শ্রেষ্ঠতর ছিল, কারণ, সে নিরিখের ফুটবল, ক্রিকেট খেলোয়াড়, দৌড়বাজ বা জিমনাষ্ট আজকাল প্রায় দেখা যায় না। স্কুলে স্কুলে প্রতিযোগিতার জন্য মারামারি, অসন্তোষ প্রভৃতির জন্য আমাদের বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে টুর্ণামেণ্টগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

পান্না এই টুর্ণামেণ্টের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, সে সময়ে তাঁর প্রতিযোগী ছিলেন কানপুর সরকারী ইস্কুলের কাশ্মিরী ছাত্র পণ্ডিত রাজনাথ ও এলাহাবাদ এংলো-বেঙ্গলী ইস্কুলের দ্বিজদাস মুখোপাধ্যায়। এই তিনজনের মধ্যে রাজনাথের দেহ-সৌষ্ঠব ছিল অপূর্ব্ব, কিন্তু পান্নার দক্ষতার কাছে সে হার মানত। দ্বিজদাসের কাছে পান্না একাধিকবার পরাজিত হয়েছেন। তোমরা অনেক ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছ এবং অনেকের খেলার কারিগরীর কথা মনে রেখেছ। আমিও কলিকাতা থেকে লাহোর পর্য্যন্ত অনেক স্থানে ফুটবল খেলা দেখেছি, কিন্তু দ্বিজদাসের সমকক্ষ ফুলব্যাক দেখিনি। তিনি ছিলেন মোহনবাগানের ঘুঁতি সুকুল ও সুধীর সরকারের সমসাময়িক, কিন্তু তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। কলিকাতায় বাস করলে আজ দ্বিজদাসের নাম বাঙালী জাতি ভুলতে পারত না।

পান্নার সেজ ভাই অক্ষয় চক্রবর্ত্তী দুর্দ্ধর্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। সুবিখ্যাত লর্ড হক তাঁর জিঙ্গারী টিম নিয়ে একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কলিকাতায় তাঁরা ক্যালকাটা ক্লাবের বিরুদ্ধে

খেলেছিলেন, ক্যালকাটা ক্লাবের দিকে ছিলেন রঞ্জী সিংজী। আমার এখনো মনে আছে, রঞ্জী প্রথম ইনিংসে ৩২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩২ রাণ করেছিলেন। রঞ্জী লর্ড হকের সঙ্গে কানপুরে আসেন এবং কানপুরে ইংরেজদের ক্লাব কানপুর জিমখানার সঙ্গে জিঙ্গারী ক্লাবের খেলা হয়। জিমখানার তরফে খেলেন অক্ষয় চক্রবর্ত্তী। তিনি রঞ্জীকে দু'বার বোল্ড আউট করেন, রঞ্জী ১০এর বেশী রাণ করতে পারেন নি। এই বিশিষ্ট ঘটনার স্মারক হিসাবে আজও রঞ্জীর দেওয়া 'সূভেনীর' (Souvenir) অক্ষয়বাবুর কাছে আছে।

কানপুরের আর একজন বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কথা তোমাদের বলি। তিনি এ-যুগে জন্মালে তাঁর নাম আজ অন্ততঃ মেজর নাইডুর চেয়ে কম বিখ্যাত হ'ত না। এঁর নাম বিশ্বরঞ্জন পাল, তাঁর খেলার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্টাইলিস খেলা তোমরা খুবই কম দেখেছ। খেলার জন্যে তিনি কলেজে কায়েমী হয়েছিলেন, আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, বিশ্বরঞ্জন তখন এফ-এ ক্লাসে, তারপর আমরা এককালে বি-এ পড়েছি।

কানপুরে আমি কয়েকটি কুস্তির 'দঙ্গল' দেখি, তাতে যে-সকল পহলবান এসেছিল আজ তাদের কাউকে আমার মনে নেই, কারণ, তের বৎসর বয়সে কুস্তি বা কুস্তিগীরদের দাম বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই দঙ্গলের কোনটাতে আমি প্রথম বড় পালোয়ান দেখি মহাদেওকে, তাকে আমি লড়তে দেখিনি, কারণ কিছুদিন পরেই তার অপঘাত-মৃত্যু হয়। লোকমুখে শুনতাম, মহাদেও-এর মত গুণী মল্ল উত্তরপ্রদেশে আর ছিল না। মহাদেও-এর দেহে মেদবাহুল্য ছিল না, ছিল পেশীবাহুল্য ও অমানুষিক ক্ষিপ্রতা। ভবানা সিংকে

আমি কানপুরেই লড়তে দেখেছি। এই ক্ষত্রী যুবকের মত, এক হাসান বখ্‌শ্‌ ছাড়া, কোন মল্লের এত চমৎকার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিনি। ভবানার ভবিষ্যৎ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, কিন্তু এক গুরুতর অপরাধ ক'রে ভবানা দীর্ঘকালের জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়।

কানপুরের এই একবৎসর আমার ব্যায়ামীজীবনের বিশিষ্টকাল। কানপুরে না এলে এবং পান্না ইত্যাদির দ্বারা অনুপ্রাণিত না হ'লে বোধ হয় ব্যায়ামের প্রতি আমার এত ঝোঁক হ'ত না। ব্যায়াম এই সময়টায় আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। তারপর আমরা এলাম লক্ষ্ণৌ শহরে। এখানেও আমাদের আসার আগে পর্য্যন্ত এক বিখ্যাত বাঙালী ব্যায়ামাগার ছিল, তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বঙ্গবাবু, কিন্তু এই ব্যায়ামাগারটি বেশী দিন টেঁকেনি। তখনকার দিনে লক্ষ্ণৌএর বাঙালী যুবকদের ব্যায়ামের চেয়ে খেলার প্রতি ঝোঁক ছিল বেশী। আমার ব্যায়াম অভ্যাস কাজে-কাজেই একা একা চলত। না ছিল কোন যন্ত্রপাতি, না ছিল কোন সঙ্গী। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ব্যায়াম করতে হ'ত। আজ তোমরা সে কথাটা বুঝবে না, কারণ তোমাদের কালে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন তোমাদের বাপ মা, খেলা ব্যায়ামে তোমাদের উৎসাহিত করেন, বিদ্যালয়েও ব্যায়াম-খেলা অবশ্যকর্ত্তব্য হয়ে উঠেছে। আমাদের বাল্যকালে ইংরেজী খেলা ততটা দোষণীয় না হলেও, ব্যায়াম অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠেরা ছেলেদের ব্যায়াম করা ইতরজনোচিত ব'লে মনে করতেন। স্কুলেও ফুটবল খেলা নিন্দনীয় ছিল, কারণ প্রত্যেক স্কুলে একদল ক'রে প্রায়-পেশাদার খেলোয়াড় পোষা হ'ত। আমি এমনও দেখেছি, নূতন কোন শিক্ষক এই খেলোয়াড়ের দলের

ইংলণ্ডে ভারতীয় মল্লের দল (১৯১১)।

ছাগা রমজান গুলাম মহীউদ্দীন কালা টালা

মহমুদ আহমদ বখশ্ রামমূর্তি মজিদ —

কাউকে পড়া জিজ্ঞাসা করলে সে একগাল হেসে উত্তর দিত—I am in the team, sir! তাদের যখন ইচ্ছা হ'ত তারা স্কুলে আসত, এবং প্রমোশনও আটকাতো না তাদের। কিন্তু শিক্ষকেরা তাদের ঘৃণা করত, তারা চাইত না যে অন্য ছেলেরা এই দলে মেশে। এই দলের ছেলেগুলি গুরুঠাকুরের মত স্কুলে পালিত হ'ত, এবং মাঝে মাঝে নানা কুকর্ম্মও যে করত না এমন নয়! কাজেই আমাদের ফুটবল খেলারও অনেক অন্তরায় ছিল।

কিন্তু ঝোঁক থাকলে মানুষ বিজন অরণ্যে বসেও তা পূর্ণ করতে পারে। একদা আমার গ্রিপ ডাম্বেলের প্রয়োজন হ'ল। মনে এমন ভরসা ছিলনা যে, বাড়ীর কারো কাছে সেটার মূল্য ভিক্ষা করি। ছ'টাকা তখন আমাদের কাছে অনেক টাকা, দৌড় ছিল—অর্থাৎ যাচ্ঞা করবার সাহসে যা কুলাতো সেটি একটি অকিঞ্চিৎকর সিকি। গোটা টাকা পেতে হ'লে কতটা যে কষ্ট করতে হ'ত তা তোমরা এখনি জানতে পারবে।

গ্রিপ ডাম্বেল চাই, এই প্রেরণাটুকুই আমার যথেষ্ট ছিল। বিনা পয়সায় ডাম্বেল সংগ্রহ করতে হবে, মস্তিষ্কে শয়তানের কারখানা জেগে উঠল, এবং অচিরেই প্ল্যানও আবিষ্কার করা গেল। যন্ত্রের মধ্যে ছুরি ও একটা ভোতা কাটারী। আবলুসকাঠের অতীব মোটা রুলর যন্ত্রের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হ'ল, দুটি খণ্ড মাঝখানে চিরে চারটি হ'ল। এয়ার গানের আর প্রয়োজন ছিল না, তার নল্‌চে ভাঙ্‌তে লম্বা একটি স্প্রিং বার হ'ল, সেটিও চার ভাগে বিভক্ত হ'ল। টুকরো দুটো শক্ত কাঠের প্রান্তে ছুরি দিয়ে চারটি ছেঁদা করতে দু'মাসের সমগ্র বিকেলবেলাটা কাট্‌ল। পেরেক পুড়িয়ে স্প্রিংএর ভেতর দিয়ে সেই কাঠে বসানো

যে কত অধ্যবসায় ও শ্রমসাধ্য তা আজ তোমাদের বোঝাতে পারব না। কিন্তু ছ'মাসে আমার গ্রিপ ডাম্বেল তৈরী হ'ল। এবং তা দিয়ে ব্যায়ামও করলাম ছ'মাসকাল।

মানুষ যা অন্তরের সহিত কামনা করে, তা বোধহয় পায়; আমিও একদিন এক-জোড়া প্রকৃত গ্রিপ ডাম্বেল পেলাম। স্যাণ্ডোকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, মনে মনে জানতাম সে চিঠির উত্তর পাবার আমি যোগ্য নই। এক সন্ধ্যায় আমার পিতার হাত থেকে একটা খুব বড় মোটা খাম পেলাম, টিকিটে লণ্ডন ডাকঘরের ছাপ। ভিতরে ছিল স্যাণ্ডোর নাম সই-করা চমৎকার একটি ছবি, একটি ছোট বই এবং উৎসাহপূর্ণ এক চিঠি। নিজের ঘরে তাই নিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ বাবার ঘরে ডাক পড়ল। সভয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে বুঝলাম, ভয় করবার কিছু নেই, কারণ, গুড়গুড়ির আওয়াজ দীর্ঘ ও শান্ত (তোমরা জান বোধহয়, গুড়গুড়ির ডাকের মত গুরুজনদের মেজাজ বোঝবার আর কোন বিশিষ্ট উপায় নেই!) প্রশ্ন হ'ল—'ও চিঠি কার?' কম্পিত চিত্তে বল্লাম—'স্যাণ্ডোর'। 'তোকে চিঠি দিলে যে?' বল্লাম—'আমি তাকে দিয়েছিলাম'। শব্দ হ'ল—'হুঁ'। মনে মনে প্রমাদ গণলাম। প্রশ্ন হ'ল, 'তুই ব্যায়াম করিস?' স্বীকার করলাম। 'কি দিয়ে করিস?' তাও বললাম। 'গ্রিপ ডাম্বেলের দাম কত?' উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'ছ'টাকা।' 'আমার জামার পকেট থেকে ছ'টা টাকা নিস্।'

এত আনন্দিত বোধহয় জীবনে কখনো হইনি। তখনি ছুটলাম পাশের বাড়ীর বন্ধুর কাছে, ডাম্বেল কিনতে হবে। সারারাত চোখের পাতা বুজতে পারলাম না। রাত থাকতেই সেই শীতের

দিনে দেড়ক্রোশ হেঁটে 'মারে' কোম্পানীর দোকানে উপস্থিত হলাম, দোকান বন্ধ। চৌকিদার খিড়কির দরজায় যেতে বল্‌লে। সেখানে ডাম্বেলের দাম শুনলাম, সাড়ে সাত টাকা। ক্ষুব্ধচিত্তে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন বেলা হয়েছে, বাড়ী ঢুকতেই বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল, কৈফিয়ৎ দেবার পর হুকুম পেলাম,—'টাকা পকেটে রেখে দাওগে।'

বিশ্বসংসার অন্ধকার হয়ে গেল! বিকালবেলা যখন ডাম্বেলের আশা ত্যাগ করেছি, বাবার চাপরাশির হাতে সেই পরিচিত বাক্স দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলাম।

দুই

তখন বর্ষাকাল। সবেমাত্র দশম শ্রেণীতে উঠেছি। ইস্কুলে পড়াশুনার চাপ যেমন, বাড়ীতেও দুটি শিক্ষকের কল্যাণে নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই। বিশেষ ক'রে অঙ্কশাস্ত্রে আমার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য পালবাবু দুনিয়ার অঙ্কের বই একত্র ক'রে আমাকে তখন চাপা দিয়েছেন, জীবনে তখন অঙ্ক ছাড়া কিছু নেই। যে বইগুলির ব্যবহার আমার প্রপিতামহের কাল থেকেই উঠে গিছ্‌ল, পালবাবুর কৃপায় সেগুলির কসরতেও তখন অভ্যস্ত হচ্ছি। এমন সময় শুনলাম, রামমূর্ত্তি এসেছেন। অনেক মিনতির পর আট আনা পয়সা জুট্‌ল এবং প্রথম রাত্রে রামমূর্ত্তিকে দেখে ধন্য হলাম।

তোমাদের কাছে রামমূর্ত্তির খ্যাতির ভিত্তি তাঁর বুকের ওপর হাতী চাপানো। আমি বলি, তা নয়। বুকে হাতী রাখার প্রবর্ত্তক হলেও রামমূর্ত্তি শক্তির শ্রেষ্ঠতর নিদর্শন দিয়ে গেছেন। রামমূর্ত্তি এবং তাঁর পরবর্ত্তী বলীদের শক্তির খেলা বুঝতে হ'লে তোমাদের আরো কিছু বোঝা দরকার। আমি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্ততঃ ছ'জন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বুকে নানা কায়দায় হাতীকে রাখতে দেখেছি। এ-ধরণে বলপ্রকাশ করা অত্যন্ত প্রশংসার্হ হলেও শক্তির নিরিখে খুব বড় কথা নয়। হাতী রাখা বা অন্য ধরণের বোঝা বুকে ধারণ করার আমাদের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। আমাদের শক্তিপ্রকাশ সাধারণতঃ passive ধরণে, কারণ আমরা যে-কোন কারণেই হোক বিশ্রামপরায়ণ। য়ুরোপীয় বলীরা কদাচিৎ passive উপায়ে বল

প্রদর্শন ক'রে থাকে। তাদের অনেকে ঘোড়া হাতী প্রভৃতি জন্তু নিয়ে খেলা দেখিয়েছে, কিন্তু কেবল মাত্র ভার ধারণ ক'রে রেখে তারা বীর্য্য দেখাতে চায়নি, দেখিয়েছে সে ভার মাটি থেকে তুলে। অর্থাৎ তারা নিজের দেহের ভারসহনশীলতাকে ততটা দাম দেয়নি, যতটা দিয়েছে আকুঞ্চিত পেশীর কেন্দ্রীভূত শক্তিকে। রামমূর্ত্তির তুলনায় অনেক দুর্ব্বল এবং হাল্কা ওজনের ব্যক্তি বুকে হাতী রেখেছে ও বুক ও উরুর ওপর দিয়ে বোঝাই-করা গাড়ী চালিয়েছে।

রামমূর্ত্তির যা কসরৎ আমি দেখেছি তার মধ্যে দুইটি আমার অতুলনীয় ব'লে মনে হয়। নূতন নূতন তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে, অর্থাৎ পা আটকাবার কোন উপায় না ক'রে মোটরগাড়ী আটকাতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাঁকে আর এ ধরণে আমি মোটর থামাতে দেখিনি।

তিনি পিঠের ওপর ৮০০০ পাউণ্ড ওজনের একটা পাথর রাখতেন। অনেকগুলি বলবান ব্যক্তি সেই পাথর তাঁর পিঠের ওপর স্থাপন করত। কয়েক সেকেণ্ড পাথরটা স্থির ভাবে রেখে তিনি ধীরে-ধীরে সেটা দোলাতে আরম্ভ করতেন। দোলানয় যথেষ্ট গতিপ্রদান ক'রে সেই বিরাট পাথরটাকে রামমূর্ত্তি পাশের দিকে ছুঁড়ে ফেলতেন এবং যাতে সেটা আবার তাঁর দেহের ওপর গড়িয়ে না পড়ে সেই জন্য 'লঙ্-আর্ম ব্যালান্স' ক'রে অর্থাৎ দেহের ভার হাতের ওপর রেখে, পা ওপরের দিকে সোজা ক'রে পাথরটাকে আরো পেছনে ঠেলে দিতেন। এ কাজ করতে যে কত শক্তি এবং কি বিষম ক্ষিপ্রতা দরকার তা কথায় বোঝানো যায় না। হাতী অনেকে বুকে রেখেছে ও রাখবে, কিন্তু এই অমানুষিক শক্তির পরিচয় আর কোন মানুষ দেবে কি না সন্দেহ। ওই একটি কসরতের জন্য ব্যায়ামজগতে

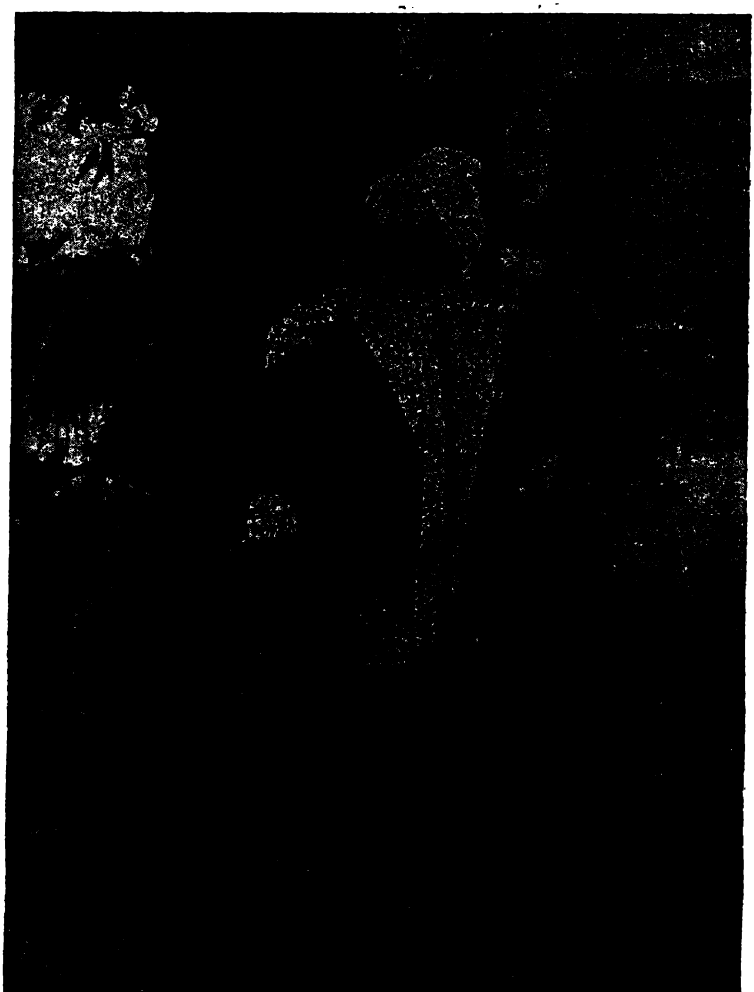

বলীশ্রেষ্ঠ রামমূর্ত্তি

রামমূর্ত্তির নাম চিরপূজ্য হয়ে থাকবে। ইংলণ্ডেও আর্থার স্যাক্সন প্রমুখ বলীরা বুকে হাতী রাখার চেয়েও রামমূর্ত্তির এই কসরৎ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিছ্‌ল।

একদিন বিকালে রামমূর্ত্তি ছাত্র মহলে সুবিধার জন্য 'ম্যাটিনে' দিলেন। আমি তাঁর অনুমতি নিয়েছিলাম, বুকে হাতী রাখার পরে তাঁর অবস্থা ভেতরে গিয়ে দেখবার। সেদিন স্কুলে হাফ-হলিডে। বাড়ী এসে মা'র কাছে পয়সা চাইলাম। বার ছয়েক রামমূর্ত্তির সার্কাস দেখে আমার তৃপ্ত হওয়া উচিত মনে ক'রে মা পয়সা দিতে অস্বীকার করলেন। তখন আমি যা করলাম, কোন বলী বা কোন ছেলে তা করেনি,—মাকে ঊর্দ্ধে তুলে আলমারির মাথায় বসিয়ে দিলাম। বাবা তখন অফিসে, কাজেই ভয়ের কোন কারণ ছিল না। মা বকতে আরম্ভ করলেন, অবশেষে প্রথম ভিক্ষায় আট আনা পয়সা দিতে সম্মত হলেন, আমি দু'টাকা চাইলাম; আবার বকাবকি আরম্ভ হ'ল। আমি জানতাম একবার স্বীকার করিয়ে নিতে পারলে, দু'টাকাই পাওয়া যাবে। তাঁকে নামিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দুটো টাকা পাওয়া গেল, এবং জলখাবারের সঙ্গে গোটা দশেক ল্যাংড়া আমও বেশী পেলাম। ছেলের শক্তির প্রমাণ পেয়ে তিনি যে খুশী হয়েছিলেন তা বলা বাহুল্য। কিন্তু এরপর নিত্যই তাঁকে আলমারির মাথায় ব'সে থাকতে হ'ত।

রামমূর্ত্তির কৃপায় সেদিন আমি তাঁর খুব নিকটে থাকতে পেয়েছিলাম। একে একে তাঁর এবং সার্কাসের অন্যান্য ব্যক্তিদের খেলা শেষ হ'ল, তারপর রামমূর্ত্তি এলেন—পাঁজরায় ও কপালে রবারের লম্বা পটি জড়ানো। তিনি বক্তৃতা দিতে থাকলেন, সেই অবসরে একটা গোল কাঠের টুকরোর ওপর ব্রিজ রেখে তার ওপর দিয়ে হাতীটাকে

বার কয়েক চালানো হ'ল। বক্তৃতা অন্তে রামমূর্ত্তি ব্রিজের নীচে শুয়ে পড়লেন ও একজন কর্ম্মচারী তাঁর চোখের ওপর একটা রুমাল ঢেকে

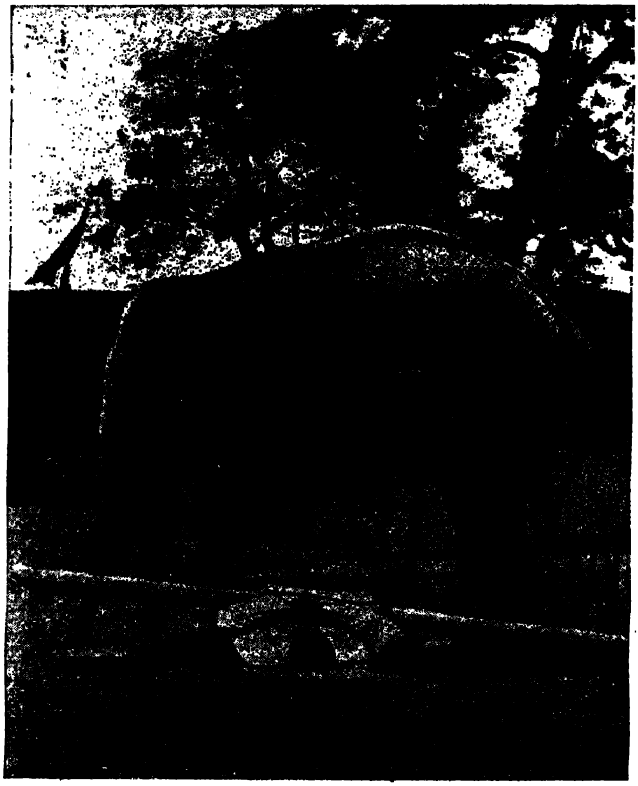

রামমূর্ত্তি হাতী তুলছেন

দিলে। ব্রিজের মাঝে ঠিক রামমূর্ত্তির বুকের ওপর একটা চৌকো তক্তা থাকত, হাতীটা ধীরপাদবিক্ষেপে ব্রিজ পার হয়ে গেল এই চৌকো তক্তাটি স্পর্শ না ক'রে। ব্রিজটার দুই দিক্ ক্ষণিকের জন্য

মাটি থেকে উঠে পড়ল। চৌকো তক্তাটি রাখার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তাতে এই বলীর বুকে হাতীর ভার সোজাসুজি (vertically) না প'ড়ে কোণাকুণিভাবে পড়ত, অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যতটা বোঝা রামমূর্ত্তিকে বইতে দেখা যেত, বাস্তবিক বোঝা ততটা হ'ত না। আমি যতগুলি লোককে হাতী রাখতে দেখেছি, একজন ছাড়া সকলেরই এইরকমের একটা হিসাব ছিল। যে লোকটির এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল, তার অমানুষিক ক্ষমতার বর্ণনা আমি যথাস্থানে করব।

হাতী বুক থেকে নেমে যাবার পরও রামমূর্ত্তি কিছুক্ষণ জড়ের মত প'ড়ে রইলেন। একজন লোক তাঁর কাঁধ স্পর্শ করলে, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের মাথা নুইয়ে অভিবাদন ক'রে পর্দ্দার আড়ালে এসে একটি নেওয়ারের খাটে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর গলার শিরা-গুলি তখন দড়ির মত ফুলে উঠেছে। মিনিট পনের পরে উঠে বসেই রামমূর্ত্তি প্রায় এক চুমুকে এক জ্যগ সরবৎ পান করলেন। তাঁর চোখের শ্বেতাংশ তখন রক্তকণিকায় ভরা। অনেক পরে একজন পরিচারক তাঁর রবারের পটি দুটি খুলে নিলে। এই ব্যাপারে তাঁর যে বিষম শক্তিক্ষয় হ'ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন আমি সত্যই বিশ্বাস করতাম যে, প্রাণায়ামের বলে রামমূর্ত্তি এসব ক'রে থাকেন। কিন্তু ভাগবৎ রায়কে দেখবার পর থেকে আমার সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে।

রামমূর্ত্তির আর একটি চমৎকার কসরৎ ছিল, তাকে তিনি বলতেন 'নাগপাশ'। তিনি নিজের দেহটাকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করতেন, তারপর তাঁকে লোহার শিকল জড়িয়ে বাঁধা হ'ত। দেহ আকুঞ্চন

করার সঙ্গে এই লৌহপাশ তাঁর পায়ের কাছে খুলে পড়ত। তাঁর এই বিশেষ খেলাটি বার বার দেখেও আমার তৃপ্তি হয়নি।

রামমূর্ত্তি সারা ভারতবর্ষে শক্তি প্রদর্শন ক'রে বেড়িয়ে, যুবজনকে নূতন প্রেরণা দিয়েছেন। স্যাণ্ডো যেমন আপনার প্রতিভা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে য়ুরোপে ব্যায়ামচর্চ্চার ভিত্তি নূতন ক'রে স্থাপন করেছিলেন, রামমূর্ত্তিও ভারতে নব ব্যায়ামান্দোলনের অগ্রদূত হয়েছিলেন। উত্তরকালে অনেক ব্যক্তি তাঁর অনেক কৌশল অনুকরণ করেছেন বটে, কিন্তু কেউই তাঁর মত সারা ভারতে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। তার কারণ, রামমূর্ত্তি শুধু বলী ছিলেন না, দেশের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানে অনেক অর্থ দান করেছেন। তিনি যৌবন-কালে লাখ-লাখ টাকা রোজগার করেছেন, দানও করেছেন তেমনি দরাজ হাতে। রামমূর্ত্তি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। কোন প্রার্থী তাঁর কাছ থেকে কখনো বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যায়নি। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বিখ্যাত মল্ল গামা ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার পর রামমূর্ত্তি এক কুস্তিগীরের দল নিয়ে ১৯১১ সালে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ইংরেজের দেশে নিজের শক্তির পরিচয় দেবার অবসর পাননি। লণ্ডনে সংবাদপত্র-সেবী ও বিশিষ্ট বলীদের সামনে শক্তি প্রদর্শন করার অব্যবহিত পরে, লিভারপুল সহরে প্রেস পারফর্মেন্সের সময়ে হাতীর চাপে ব্রিজ ফেটে একটা পেরেক তাঁর বুকের পেশীতে ঢুকে যায়। সেজন্য তাঁকে হাসপাতালে যেতে ও খেলা দেখানো বন্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দলের কুস্তিগীরদের কয়েকজন ভুবন-জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। আহমদ্ বখ্স্, সুবিখ্যাত সুইস

পালোয়ান মরিস ডিরিয়াজ ও আর্ম্মাণ্ড কার্পিলড্‌কে অবলীলাক্রমে পরাজিত করেছিলেন। গুলাম মহীউদ্দীন অল্পকালের মধ্যে গ্রীকো-রোমান চালের কুস্তি শিখে, পৃথিবীর গ্রীকো-রোমান চ্যাম্পিয়ান মরিস গ্যাম্বিয়েকে অত্যন্ত সহজে হারিয়েছিলেন। গুলামের শিষ্য ছাগা ও তীলা-ও এই নূতন চালের কুস্তি শিখে কয়েকজন নামকরা ফরাসী পহলবানদের হারিয়েছিলেন। কেবল কালা পহলবান শিকাগো শহরে বড় বিস্কোর কাছে প্রায় তিন ঘণ্টা লড়ে হেরে গিয়েছিলেন।

রামমূর্ত্তি বিলেত থেকে ফিরে লক্ষ্ণৌ এলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর মতে ও-দেশে তখন তিনজন প্রকৃত বলী ছিল, আর্থার স্যাক্সন, কুস্তিগীর হেকেনস্মিথ ও বিখ্যাত মুষ্টি-যোদ্ধা জ্যাক জনসন। জ্যাক জনসনের সঙ্গে রামমূর্ত্তির খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল।

রামমূর্ত্তির ব্যায়াম-কৌশল দেখে দেখে আমি যে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম এ-কথা বলা বাহুল্য। তাঁর সঙ্গে লোকে বাজী রেখে লোহার শিকল ছিঁড়তে দিত, তাই দেখে আমারও ওইরকম কিছু একটা করবার ইচ্ছা হ'ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শিকলের পরিবর্ত্তে জোগাড় হলো, কূয়া থেকে জল তোলার পুরাণো এক দড়ি। বিকালে স্কুল থেকে যখন বাড়ী এলাম তখন বাবা অফিসে এবং মা কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন। আমাদের একটা খাবার-ঘর ছিল; তার দরজার চৌকাঠের তলায় জল নিকাশের ছিদ্রে দড়ি গলিয়ে, কাঁধে বালিশ রেখে সেটাকে বাঁধলাম। তারপর রামমূর্ত্তির চালে এবং তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দড়িটার ওপর হেঁচকা দিতে থাকলাম। পুরাণো দড়িতেও তখনো যে এতটা দম ছিল তা আমার জানা ছিল না। বিশ-তিরিশ টানেও দড়ির কিছু হ'ল না, কিন্তু আমি শ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

অবশেষে মরিয়া হয়ে কয়েকবার সজোরে টান দিতে হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে গেল। দরজার চৌকাঠ ছিল ছোট, আমার সে-সময়ে মনে ছিল না যে, ও ঘরটাতে আমাকে মাথা নীচু ক'রে ঢুকতে হয়। দড়ি ছেঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মাথা ওপরের চৌকাঠে লাগল, তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি আমি ওপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি, ঘরে আলো জ্বলছে এবং পাশে বাবা, মা ও আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ব'সে আছেন। আমাকে চোখ চাইতে দেখে বাবা চাকরকে বল্লেন—'বংশী, রুল-গাছটা নিয়ে আয়।' ডাক্তারবাবু "ত" উচ্চারণ না করতে পেরে "ট" বলতেন, বল্লেন—'এই ড়কম কড়েই টুমি মড়বে।' পরদিন কিন্তু স্কুল যাবার কোন ব্যাঘাত হয়নি। এই ঘটনার কিছু-কাল পরে বুকে নারকেল দড়ি বেঁধে ছিঁড়তে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। দড়ি ছিঁড়ল বটে, কিন্তু তাতে বুকের মাংস কেটে যে ক্ষত হয়েছিল তা সারতে অনেক দিন লেগেছিল।

যখনকার কথা বলছি, সে-সময়ে রামমূর্ত্তির সাধারণ বুকের মাপ ছিল—৪৮ ইঞ্চি, ফোলালে বুকের মাপ হ'ত ৫৮ ইঞ্চি। তাঁর মত উরুর মাপ বোধহয় আর কোন বলীর হয়নি, সে মাপ ছিল ৩৩ ইঞ্চি। আমি রামমূর্ত্তিকে খালি গায়ে ফোটো তোলাতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু কোনদিন তাঁকে সম্মত করাতে পারিনি ; সম্মত না হবার কারণ, তিনি অত্যন্ত রোমশ ছিলেন।

তিন

১৯১০-১১ সালের শীতকালে এলাহাবাদে যে বিরাট্ প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে নানাপ্রকার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। এইখানে আমি প্রথমে এরোপ্লেন দেখি, সে এরোপ্লেনের চালক ছিলেন, মঁসিয়ে পিকেট। সর্ব্বপ্রথম এয়ার-মেলের সৃষ্টিও সেই সময়ে এলাহাবাদেই হয়েছিল। আমার কাছে এই প্রথম এয়ার-মেলের একটি ডাকটিকিট ছিল, সেটি এখনো আমার এক বন্ধুর কাছে আছে। এখন তোমরা রোজই শুনছ যে, এরোপ্লেনগুলি হাজার হাজার মাইল পথ অবলীলায় চলে যাচ্ছে। ভারতের এই 'প্রথম আকাশযান' এলাহাবাদ থেকে মিরজাপুর, মাত্র পঞ্চাশ মাইল যেতে পারে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য একজিবিশন কমিটি ৫০০৲ টাকা পারিতোষিক দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পিকেট সাহেবের মিরজাপুর পর্য্যন্ত উড়ে যেতে ভরসা হয়নি।

প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে আমোদের ব্যবস্থা ছাড়া বাইরেও নানা আকর্ষণ করবার ব্যাপার ছিল, তার মধ্যে প্রধান স্থান নিয়েছিল, সার্কাসের দল। এইখানে আমি রামমূর্ত্তিকে একসঙ্গে দু'খানা মোটরগাড়ী আটকাতে দেখি। আমাদের সময়ে প্রফেসর বোসের সার্কাস খুব বিখ্যাত ছিল, এমন চমৎকার সার্কাস তোমরা অনেকেই দেখনি। প্রদর্শনীতে আসবার সময়ে প্রফেসর বোস একটি বিশিষ্ট লোককে জোগাড় করেছিলেন, তাঁর সার্কাসী-নাম ছিল, লছমনমূর্ত্তি। মাথার অর্দ্ধেক চুল পাকা এবং ছিপছিপে রোগা হলেও লছমনমূর্ত্তি বুকে

হাতী রাখতে পারতেন। আমি কিন্তু তাঁকে হাতী রাখতে দেখিনি, দেখেছিলাম তাঁকে আগুনের ওপর খালি-পায়ে চলতে, এবং দর্শকদের মধ্যে থেকে তিনজন লোককে ডেকে আগুনের ওপর চালাতে। একটা কুড়ি ফুট আন্দাজ লোহার চাদরের তৈরী পাত্রে কাঠকয়লার আগুন ভরা, এই লোকটি অনায়াসে তার ওপর চলে

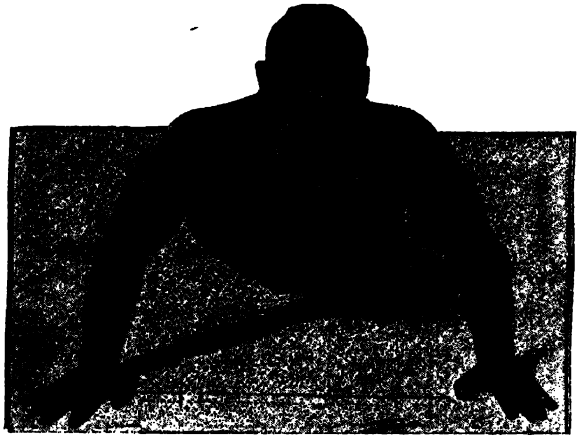

আহমদ বখ্‌শ্‌

বেড়াতে লাগলেন ও অপর লোকদেরও চালালেন। এই কৌশলে অবশ্য শক্তির কিছু ছিল না। তিনি একটা শিকলও ছিঁড়েছিলেন, কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করবার মত কিছু নয়।

এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে কুস্তির যে দঙ্গল হয়েছিল, তত-বড় দঙ্গল আর কখনো বোধহয় এ-দেশে হয়নি। বিশেষ ক'রে এই দঙ্গল এবং গামাকে দেখবার জন্যই আমি তখন এলাহাবাদে এসেছিলাম।

গামা তখন সবেমাত্র লণ্ডনে ডাক্তার রোলার ও বড় বিস্কোকে পরাজিত ক'রে এসেছেন, খ্যাতি আর আদরের তাঁর শেষ নাই। তাঁকে দেখবার জন্য আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য হয়েছিল। দঙ্গল হয়েছিল, যুক্ত-প্রদেশ ও ভারতবর্ষের চ্যাম্পিয়ন নির্ণয় করার জন্য। কেবল পরলোকগত গুলামের ভাই কল্লু ও রহমানী ছাড়া এমন কোন নামজাদা কুস্তিগীর ছিল না যে এ-দঙ্গলে যোগ দেয়নি। যুক্তপ্রদেশের চ্যাম্পিয়ন হ'ল 'লংড়া' পরতাবা, মথুরার এক চৌবেকে হারিয়ে। পরতাবা—রেওয়ার রাজার বেতনভোগী ছিল, তাকে খোঁড়া বলা উচিত হবে না, আসলে তার ডান পা'টি ছিল বজ্রাহত গাছের ডালের মত শুকনো। বগলে একটা 'ক্রাচ' লাগিয়ে পরতাবা আখাড়ায় প্রবেশ করলে। পঁয়তাড়া করতে করতে হঠাৎ ক্রাচটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সিংহের মত আক্রমণ করলে, এবং পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে পরতাবা জয়ী হ'ল। একটা পা শুকনো হলেও তার দৈহিক উৎকর্ষ ছিল চমৎকার। আর অঙ্গ সম্পূর্ণ হ'লে সে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মল্ল হতে পারত।

কুস্তির স্থানটি ছিল একটা বিরাট্ চায়ের পিরিচের মত; মাঝ-খানের দড়ি-ঘেরা উঁচু চবুতারায় আখাড়া, চারিদিকে ঢালু জমিতে দর্শকদের বসবার জায়গা। মুষ্টি-যুদ্ধের সময়ে আখাড়ার ওপর তক্তা পেতে সেটাকে রিংএ পরিণত করা হ'ত।

আমি একজন পাঞ্জাবী পহলবানের পাশে বসেছিলাম। নিজের গরজে তার সঙ্গে অল্পকালের মধ্যে খুব ভাব জমিয়ে তুল্লাম। সে দেখাতে লাগল—ওই নারঙ্গী রঙের পাগড়ী মাথায় গামা, ওই ইমাম, কোণে ওই মানবহস্তী কিক্কড়সিং ইত্যাদি। অল্পক্ষণ পরে হাসান

বখ্‌শ্‌ আখাড়ায় ঢুকলেন। আমি আজ পর্য্যন্ত যত ভারতীয় মল্ল দেখেছি, হাসান বখ্‌শের মত সুপুরুষ কেউ নয়। যেমন চমৎকার তাঁর মুখশ্রী, তেমনি অপরাভূত তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব। তাঁর পেশীর উৎকর্ষ ছিল অত্যন্ত সুসমঞ্জস এবং পেশীর রেখাগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

পাতিয়ালায় বিস্কো ও গামার যুদ্ধ।
বিস্কো ৪২ সেকেণ্ডে হেরেছিলেন।

তাঁর দেহ, মল্লের অনুরূপ ছিল না। অপরপক্ষে তাঁর সেদিনকার প্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম বখ্‌শ্‌কে দেখে আমি হতাশ হলাম। তিনি যেমন

লম্বা, দেহ তাঁর তেমনি শিথিলভাবে তৈরী, বিপুলতা ছাড়া তাঁর দেহে দেখবার মত কিছু ছিল না। কিন্তু সে দেহ, গতি ও শক্তির

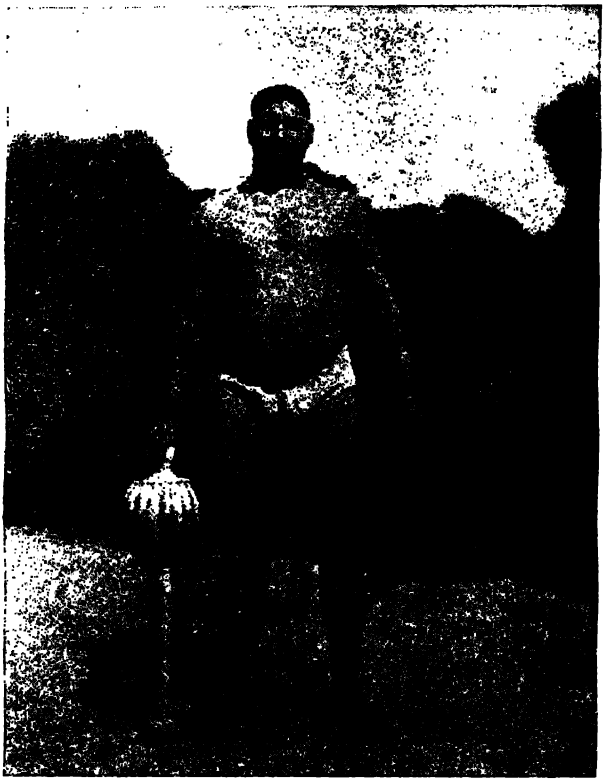

রুস্তম-ই হিন্দ ইমাম

আধার; ইমামের মত গতিশীল "ফূর্ত্তিলা" কুস্তিগীর জগতে বিরল তাঁর নামে আজও বিশেষ বলশালী মল্লদের মনে ভয় জাগে।

ইমাম বখ্‌শ্‌ও গামার সঙ্গে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন এবং পরাজিত করেছিলেন য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান গুণী মল্লকে। এই মল্লের নাম, জন লেম। তখনকার দিনে লেম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্লদের তালিকাভুক্ত ছিল। তাকে হারিয়েছিল কেবল ভুবনবিজয়ী মল্ল ফ্রাঙ্ক গচ, বড়-বিস্কো এবং মরিস ডিরিয়াজ। কিন্তু সেও ডিরিয়াজকে হারিয়েছিল এবং একবার বিস্কোর সঙ্গে সমান সমান হয়েছিল। ইমাম এই দুর্দ্ধর্ষ মল্লকে মাত্র কয়েক মিনিটে পরাজিত করেছিলেন। গামা সেদিনও আমায় বলেছেন যে, লেমের মত এত-বড় ওস্তাদ আর কোন বিদেশী মল্ল তিনি দেখেননি। ইমামের সঙ্গে কুস্তির পর লেম গামার সঙ্গে দেখা ক'রে বলেছিল যে, সে ইমামকে এত কৌশলী ও শক্তিমান ব'লে আগে মনে করেনি।

জন লেম

ইমাম ও হাসান বখ্‌শে কুস্তি আরম্ভ হ'ল। দু'জনেই বলী ও চতুর, কিন্তু ইমাম ক্ষিপ্রতর। পহলবানী-ভাষায় দু'জন কুস্তিগীরকে তুলনা করতে গেলে বলা হয়, বিশ-বিশ বা ঊনিশ-বিশ। হাসান যে ঊনিশ, যুদ্ধের প্রথম মিনিটেই তা প্রতীয়মান হ'ল। ইমাম বার-বার আক্রমণ করতে লাগলেন, হাসান আত্মরক্ষা করতে থাকলেন। ইমাম নূতন নূতন 'দাঁও' লাগান, হাসান প্রত্যেকটা প্যাঁচ কেটে দেন। দুই চতুর ওস্তাদের বুদ্ধির যুদ্ধ ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে উঠল। কিন্তু মিনিট পনেরো পরে ইমামের ক্ষিপ্রতার জন্য হাসান অস্থির

হয়ে উঠ্‌লেন এবং ঠিক তিরিশ মিনিটে ইমাম তাঁকে চিৎ ক'রে দিলেন। হেরে গিয়েও হাসান আপত্তি করলেন যে, তাঁর পিঠ মাটিতে মেলেনি। ইমাম হাসলেন এবং আবার লড়তে সম্মত হলেন। হাসান সাবধানে লড়তে থাকলেন, কেননা ইমাম তখন তাঁর আয়ত্তের বাইরে। খানিক পরে ইমাম তাঁকে মাটিতে পাতিত ক'রে একেবারে বুকে চেপে বসলেন। হাসান হাসি মুখে পরাজয় স্বীকার করলেন।

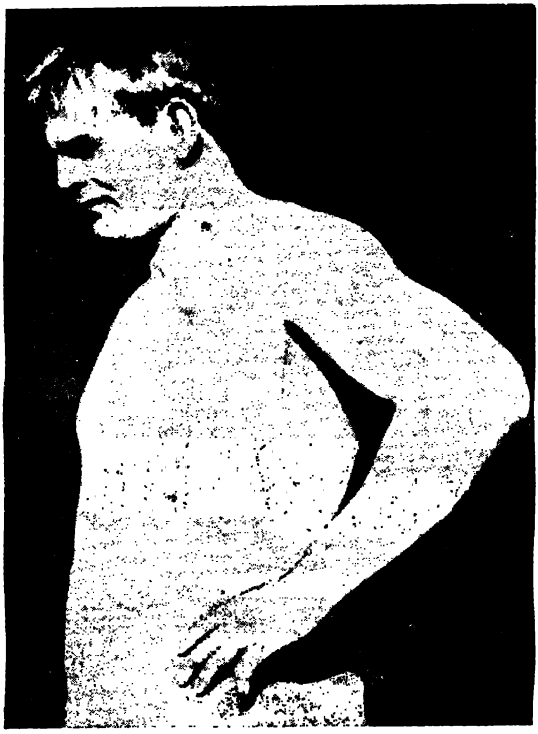

পশ্চিম ভূখণ্ডের মল্লরাজ ফ্রাঙ্ক গচ

আমি যা দেখতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম সেটা গামা রহীমের কুস্তি। গামার বয়স তখন মাত্র ২৬ বৎসর, রহীমের চল্লিশের কাছাকাছি; কিন্তু রহীমের নামে তখনো পহলবান সম্প্রদায়ের আতঙ্ক হয়। রহীমের বাড়ী পঞ্জাবের গুজরাঁওয়ালা শহরে, আমি কয়েক বৎসর

আগে তাঁর বাড়ীতে বেড়িয়ে এসেছি। তিনি ভুবনবিখ্যাত গুলামের প্রধান শিষ্য। রহীম এবং শিয়ালকোটের করীম বখ্‌শের মত দাঁও-প্যাঁচের ওস্তাদ এখনো ভারতে গুলাম ছাড়া কেউ হয়নি। সে-সময়ে রহীম রামমূর্ত্তির কাছে কাজ করতেন।

কুস্তি আরম্ভ হবার একটু আগে গামা এক-লাফে আখাড়ায় এসে উঠলেন। মাথায় নারঙ্গী রঙের পাগড়ী, গায়ে ভায়েলার ধূসরবর্ণ একটা কামিজ, কিন্তু উরু দুটি নগ্ন। তিনি তখন হাত দোলাতে দোলাতে মাঝে মাঝে একটা বৈঠক দিয়ে দেহ গরম করছেন। উরু দুইটি দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, যেমন তাদের গঠন, তেমনি সৌন্দর্য্য। তোমাদের মধ্যে যারা এখনকার গামাকে দেখেছে, তারা গামার দেহের আয়তনটাই দেখেছে; তা দেখে গামার পূর্ব্বকালের দৈহিক সৌন্দর্য্যের কোন আন্দাজ করতে পারা যায় না। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে, গামার আর দৈহিক সৌন্দর্য্যের বয়স নেই। তাঁর গৌর বর্ণ তামাটে হয়ে গেছে, ত্বক কর্কশ হয়েছে, আর দেহের আয়তন বেড়েছে অনেক; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকল ব্যায়ামীর যা হয়ে থাকে।

রহীমের সঙ্গে কুস্তির গল্প পড়বার আগে তোমাদের এই সিংহবীর্য্য পুরুষের জীবনী জানা দরকার। পঞ্জাবের অধিপতি রণজিৎ সিংকে ইতিহাস-লেখকেরা পঞ্জাব-সিংহ ব'লে বর্ণনা করেছেন, গামাও তাঁর বিপুল বলের কারণে ও-নামটা অর্জ্জন করেছেন। আমি যেমন ক'রে গামাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি, তোমরা তেমন ক'রে দেখতে পেলে, আমার মত তোমাদেরও মনে হ'ত যে, ভীম, রুস্তম বা হারকিউলিস্ নিশ্চয়ই এত শক্তিশালী ছিলেন না।

এ-কথা মনে করবার বিশেষ কারণ আছে, প্রসঙ্গক্রমে আমি সে-কথা বলব।

গামা 'খানদানী' পহলবান, অর্থাৎ কুস্তিগীরের পেশা তাঁদের বংশে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। গামা আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর বংশের লোক দেড়শো বছর ধ'রে মল্লরাজ আখ্যা ভোগ ক'রে আসছে। কথাটা অবশ্য ঐতিহাসিক-সত্য নয়, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা কুস্তি ভিন্ন অন্য কোন পেশা অবলম্বন করেন নি।

গামার যখন পিতৃবিয়োগ হয়েছিল তখন তাঁর বয়স মোটে আট বৎসর, ইমামের বয়স তিন, ও ওঁদের সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের বয়স দেড় বৎসর। অন্নের অভাব ওঁদের ছিল না, অভাব হ'ল উপযুক্ত শিক্ষকের। কিন্তু গামার সৌভাগ্যক্রমে তাঁর শিক্ষার ভার পড়ল তাঁর পিতৃবন্ধু মাধো সিংহের উপর। মাধো সিং পঞ্জাবের নাম-করা মল্ল। গুলাম ও কিক্কড় সিংএর মত মল্লের সঙ্গে তিনি লড়েছিলেন। তাঁর হাতে প'ড়ে গামার প্রতিভার উন্মেষ হ'ল। ইমাম বখ্শ্‌কে শিক্ষা গামা নিজে দিয়েছেন, এঁদের ছোট ভাই দুর্ব্বল ব্যক্তি, তিনি মল্লের পেশা অবলম্বন করেন নি। ১৯০৯ সালে লাহোর শহরে দু'জন প্রতিভাবান্ মল্লের নাম ছড়িয়ে পড়ল, একজন গামা, অন্যজন গুলাম মুহীউদ্দিন 'লাহোরওয়ালা'। বিশেষজ্ঞরা বলতেন যে, এঁদের মধ্যেই একজন উত্তরকালে ভারতের মল্লনেতা হবেন। লোকে উৎসুক হয়ে উঠল, এঁদের মধ্যে কে বড় নির্ণয় করবার জন্য। একদিন কুস্তিও হ'ল এবং গামা আট মিনিটে মুহীউদ্দিনকে পরাজিত করবার সঙ্গে সঙ্গে মল্লজগতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

গামার প্রতিভা দেখে তাঁকে বিলেত নিয়ে গেলেন শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও গোবরবাবু, সঙ্গে গেলেন ইমাম বখ্‌শ্‌, বিখ্যাত মল্ল আহমদ বখ্‌শ্‌ ও গামু নামের আর-এক ব্যক্তি। এই গামু ও গামু বালিওয়ালা, অর্থাৎ গুঙ্গার বাপ, এক ব্যক্তি নয়। এঁদের ম্যানেজার হলেন এক ইংরেজ—আর, বি, বেঞ্জামিন। য়ুরোপে ভারতীয় মল্লের এই তৃতীয় অভিযান। প্রথম গিয়েছিলেন স্বনামধন্য ভূট্টান সিং, দ্বিতীয় মল্লশ্রেষ্ঠ গুলাম, তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে প্যারিসে গিয়েছিলেন। ভূট্টান সিং ভারতীয় মল্লের খ্যাতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু বয়স বেশী হবার জন্য তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হেকেন্‌স্মিথের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। গুলাম প্যারিস প্রদর্শনীতে তুর্কী-মল্ল আহ্‌মদ মদ্রালীর সঙ্গে লড়েছিলেন। ফল যে কি হয়েছিল আজ পর্য্যন্ত কেউ ঠিক বলতে পারেন না। পণ্ডিত জবাহরলাল আমাকে বলেছিলেন যে, মদ্রালীর শক্তিতে ভীত হয়ে গুলাম হেরে গিয়েছিলেন।

গামার দলকে ইংলণ্ডের লোক, প্রথমে অগ্রাহ্য করেছিল। বেঞ্জামিনের অনেক চেষ্টায় ডাক্তার রোলারের সঙ্গে গামার কুস্তির ব্যবস্থা হ'ল। ফ্রাঙ্ক গচের পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন হবার পূর্ব্বে রোলার মাস-তিনেকের জন্য সে পদবী অধিকার করেছিলেন। গামার সঙ্গে লড়বার সময়ে রোলার ইংলণ্ডেই ছিলেন, হেকেন্‌স্মিথের কুস্তির সঙ্গী হিসাবে; কারণ, হেকেন্‌স্মিথ গচের সঙ্গে লড়বার জন্য রোলারকে কাছে রেখে, শোরহ্যাম নামে এক স্থানে আখাড়া করেছিলেন। রোলার যে গামার আশা ভঙ্গ করবেন এ-বিষয়ে ইংলণ্ডের লোক নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত, রোলার অল্প কয়েক

মিনিটের মধ্যেই উপ্‌রোউপ্‌রি দুটো fall-এই হারলেন। ইংরেজ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

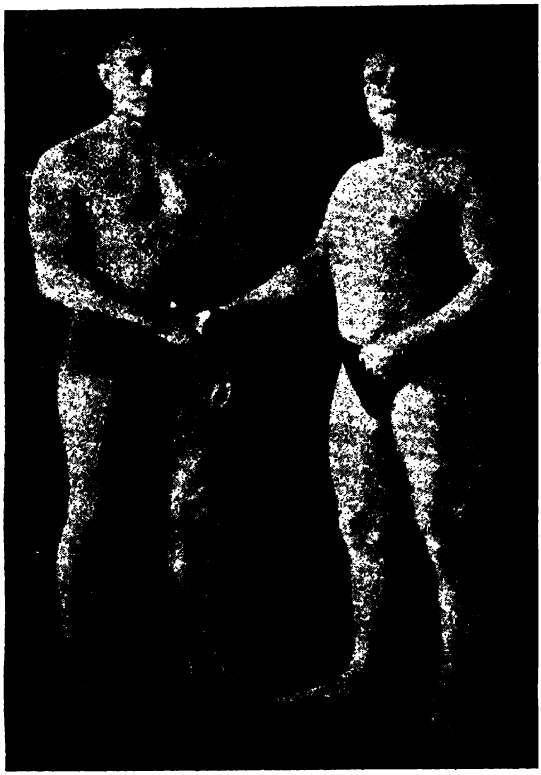

ডাক্তার রোলার ও হেকেন্‌স্মিথ

তারপর এল জন্ লেমের পালা। আগেই বলেছি যে, লেম ছিলেন য়ুরোপীয় মল্ল-জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁকে য়ুরোপীয় চ্যাম্পিয়ন বলা হ'ল, কারণ লেম তার পূর্ব্ব বৎসরে হেঙ্‌লার সার্কাসের দঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। এই বিখ্যাত সার্কাসটি প্রতি বৎসর য়ুরোপের কোন-না-কোন বিখ্যাত শহরে দঙ্গল করত এবং সে দঙ্গলে য়ুরোপের নামজাদা সব মল্লই যোগ দিতেন। কাজেই এই দঙ্গলে যে জয়ী হ'ত তাকে কেউই তুচ্ছ ব'লে মনে করত না। বেঞ্জামিনের চেষ্টায় হেঙ্‌লার-দঙ্গল বিজয়ী লেমের

সঙ্গে ইমামের কুস্তি হ'ল। কিন্তু ইমাম তাঁকে ছোট ছেলের মত ক'রে তুল্লেন। লেম জীবনে কখনো এত অল্প সময়ে এবং এমন ক'রে পরাজিত হননি। ইংলণ্ডের লোক গামার নাম দিলে, 'পঞ্জাবকেশরী' আর ইমামের নাম দিলে, 'প্যান্থার'। ইমামের যুদ্ধ প্যান্থারের যুদ্ধেরই অনুরূপ—ক্ষিপ্র, চতুর, নির্ম্মম ও অমোঘ, তাঁর হাতে কারো পার নেই!

ইংলণ্ডের মল্লেরা এই দুটি কুস্তির অপ্রত্যাশিত ফলে ভীত হয়ে উঠল, এবং ভারতীয় দলকে হারাবার জন্য তাদের জেদ বেড়ে গেল। তখন য়ুরোপীয় মল্লদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি চারজন—ভুবন-বিজেতা ফ্রাঙ্ক গচ্, জর্জ্জেস হেকেন্‌স্মিথ, বড় অর্থাৎ স্ট্র্যানিস্লস্ বিস্কো ও মরিস ডিরিয়াজ। রোলার বার বার বিস্কোকে ডাক দিতে থাকলেন, কারণ, বিস্কো তখন গচের সঙ্গে বল পরীক্ষায় সমান সমান হয়েছেন, তাঁর স্থান তখন ঠিক গচের নীচে। কিন্তু বিস্কো উত্তরকালে দু' দুবার পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন হলেও সে-সময়ে তাঁর কোন পদবী ছিল না। অনেক অনুরোধের পর বিস্কো ইংল্লণ্ডে এসে রোলারের সঙ্গে ট্রেণিং অর্থাৎ পহলবানী-কথায়, 'রিয়াজ' করতে লাগলেন। এক সন্ধ্যায় 'হবর্ণ এম্পায়ারে'র বিখ্যাত ষ্টেজে গামার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হ'ল। বিস্কো দুর্দ্ধর্ষ বলী, তাঁর দেহের মাপ ও ওজন ছিল গামার চেয়ে অনেক বেশী, তথাপি যে দু'ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কুস্তি হয়েছিল, বিস্কো তার পাঁচটা মিনিটও দাঁড়িয়ে লড়তে পারেন নি। এই দীর্ঘকাল তিনি কেবল আত্মরক্ষা করেছিলেন। গামা ঘোড়-সওয়ারের মত বিস্কোর পিঠের ওপর বসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে চিৎ করা সম্ভব হয়নি। বিস্কো কিন্তু হারলেন, যাকে বলে টেক্‌নিক্যাল হার। ইংলণ্ডের লোক গামাকে

ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠতম মল্লকে যে পারিতোষিক দেওয়া হয় সেই 'জনবুল বেল্ট' দান করলে, কিন্তু তাঁকে ইংলণ্ডের অথবা ব্রিটিশ রাজ্যের চ্যাম্পিয়ন ব'লে স্বীকার করা হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

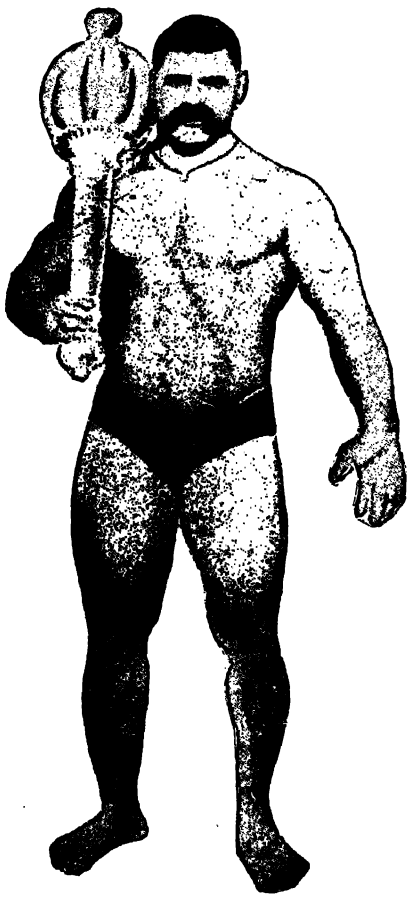

মহামল্ল গামা

গামা দেশে ফিরে এসেই রহীমের সঙ্গে লড়লেন। তার-পর একেবারে ১৯১৬ সালে শ্রেষ্ঠ হিন্দু মল্ল পণ্ডিত বিদ্দোকে গুজরাঁওয়ালা শহরে আট মিনিটে পরাজিত করলেন। ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে গামার এই শেষ যুদ্ধ।

গামার কাছে হেরে যাবার পর বিস্কো লণ্ডনের এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে লিখে-ছিলেন যে, দাঁড়িয়ে লড়তে গামা অদ্বিতীয়; দাঁড়াবার প্রত্যেক চেষ্টা গামা তাঁর বিফল করেছেন বার বার জমিতে এনে; কিন্তু মাটির কুস্তিতে ইমাম, গামার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। তখন থেকেই বিস্কো

আবার গামার সঙ্গে লড়বার চেষ্টা করছিলেন, সে চেষ্টা সফল হ'ল ১৯২৮ সালে, গামা তখন পাতিয়ালা রিয়াসতের বেতনভোগী মল্ল। এই কুস্তি হবার কিছুকাল পূর্বে আমি এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রিকায় লিখেছিলাম যে, বিস্কো পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরাজিত হবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিস্কোর হারতে এক মিনিটও লাগল না, তাঁকে স্পর্শ করবামাত্র গামা বিস্কোকে ধরাশায়ী করলেন।

পর বৎসর গামার সঙ্গে জেস্ পীটরসনের কুস্তি হ'ল। পীটরসন নিজেকে মস্ত বীর ব'লে বর্ণনা করলেও তিনি খুব বড় কুস্তিগীর ছিলেন না। বড় দঙ্গলে লড়ার মধ্যে তিনি ১৯১৫ সালে মরিস ডিরিয়াজের নোভো সার্ক দঙ্গলে লড়েছিলেন, কিন্তু জয়ী হননি; এই দঙ্গলে আমাদের গোবরবাবুও যোগ দিয়েছিলেন। পীটরসন লণ্ডনে পাতিয়ালার মহারাজকে ধরেন গামার সঙ্গে লড়বার জন্য। মহারাজ যা ব্যবস্থা করলেন তাতে এই সর্ত্ত হ'ল যে, গামা পীটরসনের ওপর বিশেষ-বিশেষ কয়েকটি দাঁও লাগাবেন না। আরো সর্ত্ত হ'ল যে, পীটরসন যাতায়াতের জন্য ফার্স্ট ক্লাস জাহাজ ভাড়া এবং কুস্তি লড়ার জন্য ২৫০০৲ টাকা পাবেন।

কুস্তির পর গামা আমাকে এক চিঠি দিয়েছিলেন এই যুদ্ধের বর্ণনা ক'রে। পীটরসন গায়ে ভেস্‌লীন মেখে আখাড়ায় এলেন এবং সেখানে বসেও আরও দু'শিশি ভেস্‌লীন মাখলেন। বিচারক ছিলেন পরলোকগত রণজীৎসিংজী ও কাশ্মীরের মহারাজা। তাঁরা কোন আপত্তি করেন নি। পীটরসন পাঁকাল মাছের মত পিচ্ছিল, তাঁকে ধরা গামার পক্ষে অসম্ভব হ'ল। অবশেষে জ্বালাতন হয়ে গামা খানিকটা মাটি নিয়ে পীটরসনের গায়ে ছুঁড়ে মারলেন, মাটি লাগল

তাঁর ডান হাঁটুতে; সেই হাঁটু ধ'রে গামা এক মিনিট বিয়াল্লিশ সেকেণ্ডে পীটরসনকে চিৎ ক'রে তাঁর বুকে চেপে বসলেন। পীটরসনের কোন ক্ষতি হ'ল কি? তিনি পকেট ভারী ক'রে বাড়ী ফিরে গেলেন।

এই হ'ল গামার স্বল্প কিন্তু বিরাট ইতিহাস। গামাকে বড় হবার জন্য খুব বেশী যুদ্ধ করতে হয়নি। তিনি মল্ল-জগতে এত বেশী বড় যে, কেউ তাঁর নিকটে যাবার সাহস রাখে না। কাছে যাবার অন্য অন্তরায় ইমাম বখ্‌শ্‌। গামার সঙ্গে লড়তে হ'লে আগে ইমামকে হারাতে হবে; আকাশের চাঁদ ধ'রে আনা বরং সহজ, কিন্তু ইমামকে আয়ত্ত করা সহজ নয়।

আমি কিন্তু গামাকে হারতে এবং চিৎ হতে দেখেছি, সে-কথা যথাসময়ে তোমাদের বলব।

এলাহাবাদের প্রদর্শনীর সেই বিরাট প্রাঙ্গণের একটা ঢালু প্রবেশপথ দিয়ে রহীম 'দীন দীন' রবে চীৎকার করতে করতে এলেন, সঙ্গে কালো আলপাকার কোট-পরা রামমূর্ত্তি ও তাঁর দলের কয়েকজন লোক। রহীমের সর্ব্বাঙ্গে গেরিমাটি মাখানো, তাতে তাঁকে ভীষণ দেখাচ্ছিল। জনসমুদ্র উৎসাহে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কোন উৎসাহ হ'ল না গামার; তিনি যেমন হাত দোলাতে দোলাতে বৈঠক দিচ্ছিলেন, তাই দিতে থাকলেন। আখাড়ার একটা দিকে সমাগত রাজন্য ও 'রইস' বৃন্দের জরিজোব্বার পোষাকে নানা বিচিত্র রংএর উৎসব লেগে গিয়েছিল। রহীম আখাড়ার বেষ্টনী দড়ির ভেতর দিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠলেন। গামা নিজের পাগড়ী ও কামিজ দূরে নিক্ষেপ করলেন। টকটকে লাল জাঙ্গিয়া-পরা এই সুন্দর, সুঠাম বিরাট

পুরুষকে দেখে মনে হ'ল, বুঝি গ্রীক পুরাণের দেবতারাও এত সুন্দর সুঠাম ছিলেন না! গামার দেহের উৎকর্ষ তখন চমৎকার, প্রত্যেক গতিতে তাঁর দেহের সুপ্তশক্তি যেন জেগে উঠ্‌তে চাইছে! সে গামার শারীরিক গঠন যে কত নয়নান্দদায়ক ছিল, তা আজ তোমাদের কোন বর্ণনা দিয়েই বোঝাতে পারব না। এখন গামার দেহে সে সৌন্দর্য্য নেই, আছে কেবল বিপুলতা, কিন্তু তাঁর সেই পুরানো বুকের গঠন আজও আছে। আমি হাজার হাজার নানা ধরণের ব্যায়ামী দেখেছি, কিন্তু গামার মত বুকের পেশীর গঠন ও উৎকর্ষ আর দেখবার আশা করিনে। গামার আর-একটি দর্শনীয় অঙ্গ তাঁর চোখ। এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আছে কেবল পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর। যাঁদের আমরা পুরুষসিংহ বলি, তাঁদেরই কেবল ওরকম দৃষ্টি থাকা সম্ভব। আমার কেবল মনে হয় যে, গামার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ওই দৃষ্টির দ্বারাই অর্দ্ধেক পরাজিত হয়। এ-কথা আমি গামাকে অনেকবার বলেছি।

রহীম আর গামার রেষারেষি ছিল খুব বেশী। ভারতে সেকালে রহীম ছাড়া গামার উপযুক্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল না। দু'জনে কুস্তি আরম্ভ করলেন প্রথানুযায়ী হাত না মিলিয়ে, মিত্রভাবাপন্ন কুস্তিগীরেরা কখনো করমর্দ্দন না ক'রে কুস্তি লড়েন না। প্রথমেই গামা সিংহবিক্রমে আক্রমণ করলেন, ঘাড়ে গামার একটা চড় খেয়ে রহীম দূরে ছিট্‌কে পড়লেন; কিন্তু গামা তাঁকে সেই অবস্থায় ধরবার পূর্ব্বেই রহীম উঠে দাঁড়িয়ে গামাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন, এমনই ক্ষিপ্র তাঁর গতি! গোড়া থেকেই মনে হ'ল, রহীমকে কেবল আত্মরক্ষা করতে হবে। গামা তাঁকে নানা প্যাঁচে ফেল্লেন অসংখ্যবার, কিন্তু কৌশলী রহীম প্রত্যেক প্যাঁচ ব্যর্থ করতে লাগলেন। কুস্তির প্রত্যেকটি

মুহূর্ত্ত চমৎকার দাঁও প্যাঁচের মার-কাটে উৎসাহজনক হয়ে উঠল। অত-বড় জনতা মুগ্ধ হয়ে নিঃশব্দে বসেছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে বুড়ো ওস্তাদদের 'বাহবা' সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল।

গামা একবার রহীমকে কায়দায় ফেলে তাঁর পিছনে গিয়ে দু'হাতে জাঙিয়া ধরলেন। তোমরা বোধহয় জান যে, ভারতীয় পহলবান একবার জাঙিয়া ধরলে প্রতিযোগীর প্রায়ই মুক্তির আশা থাকে না। গামার মত মল্ল কারো জাঙিয়া ধরলে বুঝি ভগবানও তাকে রক্ষা করতে পারেন না! রহীম এই অবস্থায় এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ সামনে ঝুঁকে প'ড়ে কি ক'রে যে বন্ধনমুক্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন, তা আজও আমার রহস্যজনক মনে হয়। রহীম ইতিমধ্যে কুস্তি ছেড়ে পালালেন দু'বার, তখন প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেছে। যুদ্ধ ঘোরতর হয়ে উঠল এবং মনে হ'ল, গামার বল যেন প্রতি মুহূর্ত্তে বেড়ে উঠ্‌ছে এবং তাঁর আক্রমণও ক্রমশঃ দুর্দ্দমনীয় হচ্ছে! এতক্ষণ কুস্তি হলেও লক্ষ্য করবার বিষয় এই হ'ল যে, গামা এত চেষ্টাতেও রহীমকে মাটিতে আনতে পারলেন না, দু'জনে দাঁড়িয়েই লড়তে লাগলেন। ক্রমাগত ছুটোছুটি করেও রহীমের বলক্ষয় হ'ল না, এইটাই সে কুস্তির সব-চেয়ে আশ্চর্য্য কথা।

এমন সময়ে একটা ঘটনা হ'ল যা আমি নিজের চোখে না দেখলে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির কথাতেও বিশ্বাস করতাম না। গামা আবার রহীমের পিছনে গিয়ে এক হাতে তাঁর জাঙিয়া ধরলেন। রহীম নিজেকে মুক্ত করতে সামনে ঝুঁকে পড়লেন বটে, কিন্তু গামার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠো শিথিল হ'ল না। গামা টান দিতে রহীমের মাথা নীচে ঝুঁকে পড়ল ও পা দুটো ওপরে উঠ্‌ল; সেই অবস্থায়

গামা তাঁর বিষম শক্তিশালী বাহু বিস্তার ক'রে এক মুহূর্ত্তের একটা আংশিক কালের জন্য রহীমকে ঝুলিয়ে রাখলেন। গামার বিপুল শক্তির শ্রেষ্ঠতর আর কোন দৃষ্টান্ত বোধহয় দেওয়া যায় না। কিন্তু রহীমের চাতুর্য্য ও কৌশলের খ্যাতি ত' আর মিথ্যা কারণে হয় নি! তিনি মুক্ত পা দিয়ে গামার পুরোবাহু ও কব্জীতে আঘাত ক'রে সর্পিল-গতিতে গামার বন্ধন থেকে বেরিয়ে গেলেন, হাজার হাজার কণ্ঠ এই ওস্তাদীর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠ্‌ল। তারপর গামা লড়তে লাগলেন মরিয়া হয়ে, আমার মনে হ'ল, রহীমের এইবার শেষ হবে। হঠাৎ রহীম আখাড়া ছেড়ে দড়ির ভেতর দিয়ে পালিয়ে নীচে গেলেন, গামাও সেখানে গিয়ে তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়লেন। ইংরেজ রেফারিটি গামার জাঙিয়া ধ'রে বৃথা খানিক টানাটানি ক'রে ক্ষান্ত হলেন। রেওয়ার মহারাজা অন্যদিকে বসেছিলেন, তিনি রামমূর্ত্তিকে এই দুই মল্লকে আলাদা ক'রে দিতে অনুরোধ করলেন। রামমূর্ত্তি করলেন কি জান? গামার জাঙিয়া ধ'রে টান দিতেই গামা রহীমকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। রহীম আর লড়তে সম্মত হলেন না, তাঁর পাঁজরায় আঘাত লেগেছিল। রেওয়ার মহারাজা নিজের চোগা খুলে গামাকে পরিয়ে দিলেন।

গামা তখন সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে বিলেত থেকে আনা 'জনবুল বেল্ট' দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমার কাছে আসতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং আমার বুকের "হেল্‌থ্ অ্যাণ্ড ষ্ট্রেঙ্‌থ্" লীগের ব্যাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, তিনি তখন ওই সংঘের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট্ হয়েছেন, সেই ক্ষণেই আমাদের ভাব হয়ে গেল এবং খানিক পরে সেই ভুবনবিখ্যাত 'জনবুল বেল্ট' নিজের বুকে জড়ালাম। গামা খুসী হয়ে হাসতে লাগলেন।

চার

পূর্ব্বদিনে দূর থেকে কিক্কড়সিংকে দেখলাম। তাঁর দেহের বিশালতার অনেক গল্প আগেই শোনা ছিল ; উপবিষ্ট অবস্থাতে তাঁকে দেখেও শোনা-কথা অতিরঞ্জিত ব'লে মনে হ'ল না। যত মল্ল তাঁর পাশাপাশি বসেছিল, কিক্কড় তাদের চেয়ে দীর্ঘতর, দেহের প্রস্থের কথা ত' বলাই চলে না, কারণ, কিক্কড়কে কোন-কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে গেলে, মানুষের বংশ ছেড়ে, ইতর প্রাণীর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হ'ত।

কিক্কড় ছিলেন অমৃতসরের লোক, তিনি 'খানদানী' মল্ল ছিলেন না, তাঁর পৈতৃক পেশা ছিল জমিদারী। কিন্তু মনেও কোরো না যে, কিক্কড় ধনী ছিলেন। বাংলাদেশের জমিদার আর পঞ্জাবী জমিদার এক নয়। পঞ্জাবে চাষীকে জমিদার বলে। কিক্কড়ের পহলবানী পেশা অবলম্বন করা কতকটা আকস্মিক কারণে। চাষবাসের ওপর তাঁর ঝোঁক ছিল না, হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর স্বাভাবিক শক্তি আবিষ্কার করলেন, তারপর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ত শক্তি পরীক্ষা করতে করতে তাঁকে কুস্তি আরম্ভ করতে হ'ল, জোয়ান বয়সে তাঁকে যখন অনেক বড় পহলবান এঁটে উঠতে পারত না, সেই সময় অপরাজেয় কুস্তিগীর ব'লে কিক্কড়ের খ্যাতি সারা পঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ল।

সেকালে আমাদের দেশে যে সব মল্ল ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্ল ব'লে স্বীকৃত হতে পারতেন। এ-কথা বলা চলত না যে, অমুক অমুকের চেয়ে বড়। এত বড় বড় মল্ল থাকার জন্যই কিক্কড় প্রথম শ্রেণীর পহলবান হলেও অদ্বিতীয়

ছিলেন না। অদ্বিতীয় ছিলেন একমাত্র গুলাম, যাঁর কাছে সকল মল্লকেই মাথা নোয়াতে হ'ত; কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে, গুলামও কিক্কড়কে সহজে আয়ত্ত করতে পারতেন না। এই দু'জনে কয়েকবার কুস্তি হয়েছিল, তার মধ্যে ইন্দোরে যে কুস্তি হয় তাতে ভাগ্য একটু সুপ্রসন্ন থাকলে কিক্কড় গুলামকে জয় করতে পারতেন। এই কুস্তির প্রথম অবস্থায় কিক্কড়ের মারের চোটে গুলাম উচ্চৈঃস্বরে কেঁদেছিলেন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে এই বিপুল বলী-প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। কিক্কড়ের সমসাময়িক সব পহলবানই খুবই খ্যাতি-সম্পন্ন ছিলেন। গুলাম ছাড়া সেই অন্য মল্লদের নাম করীম বক্স 'পেহ্‌ড়লেওয়ালা', গামু বালীওয়ালা, চন্নন চৌবে, মাধো সিং, জানী ডুঙ্গর ইত্যাদি। কেবল করীম বক্স পেহ্‌ড়লেওয়ালা গুলামের মৃত্যুর পর অল্পকালের জন্য রুস্তম-ই-হিন্দ অর্থাৎ ভারতের চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছিলেন।

কিক্কড়ের দেহ বিরাট, শক্তি অসীম এবং সহনশক্তি অসাধারণ ছিল। চুন্নিলালের মুখে কিক্কড়ের অতুলনীয় সহনশক্তির একটা গল্প শুনেছিলাম। চুন্নিলাল তখন জম্মু দরবারের মল্ল। কাশ্মীর ও জম্মুর পরলোকগত মহারাজা পরতাব সিংহের কুস্তির অত্যধিক সখ ছিল, তখনকার কালের কয়েকটি নামজাদা মল্ল তাঁর বেতনভোগী ছিলেন। দেশী রিয়াসতগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় কুস্তি উৎকর্ষের চরম শিখরে উঠেছিল। কাশ্মীর, ভাওয়ালপুর, কোল্‌হাপুর প্রভৃতি তখন অনেক মল্লকে অন্ন দিত। এখন পাতিয়ালা, ও কোল্‌হাপুর, ছাড়া কোন রাজবাড়ী আর মুক্ত হস্তে কুস্তির সেবা করে না। সেইজন্য এই বিদ্যাটির অত্যন্ত অবনতিও হতে আরম্ভ হয়েছে। সে-কথা থাক,

আমরা যা বলছিলাম সেইটাই বলি। তখন জানুয়ারী মাস, জম্মুতে প্রখর শীত। কোন দঙ্গলের জন্য নানা পহলবান জমায়েৎ হয়েছে। কিক্কড় রাজ-অতিথি হয়ে মহারাজার প্রাসাদে আছেন। রাজবাড়ীতে কারো বাত হয়েছিল, তাকে একটা ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। তোমরা বোধহয় এ ধরণের ব্যাটারী দেখেছ। এতে তার লাগানো দুটো হাতল থাকে, রোগীর হাতে হাতল দিয়ে চাবি ঘোরালে তার দেহে বিদ্যুতের ঢেউ প্রবেশ করে। এই বিদ্যুতের শক্তি, কাঁটা ঘুরিয়ে কমানো-বাড়ানো যায়। যখন চাবি ঘোরানো হয়, হাজার চেষ্টা করলেও হাতল ছাড়া যায় না, কারণ বিদ্যুৎপ্রবাহে দেহের বাতনাড়ী অবশ হয়ে যায়। একদিন সকালবেলা মহারাজা সেই ব্যাটারীটা বাইরে এনে, একে একে তাঁর সকল বেতনভুক পহলবানের সহনশক্তি পরীক্ষা করলেন, সকলেই চীৎকার ক'রে হার মানলে। চুন্নিলাল তখন মহারাজকে কিক্কড় সিংএর কথা মনে করিয়ে দিলেন। কিক্কড় সেই হাতল ধ'রে বসলেন, ক্রমশঃ ব্যাটারীর চরম শক্তি প্রয়োগ করা হ'ল, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোন কাতর শব্দ বেরোলো না, কেবল অত প্রচণ্ড শীতেও তাঁর ঘাম ঝরতে লাগল। এবার ব্যাটারীটাই হার মান্‌ল। কিক্কড়ের হাতের তালুর চামড়া অত্যন্ত মোটা ছিল। মহারাজা খুসী হয়ে তখনই কিক্কড়কে পাঁচশত মুদ্রা বখশিশ দিয়েছিলেন।

কিক্কড় দেখতে অত্যন্ত বীভৎস ছিলেন। ভারবাহী মহিষের যেমন ঘাড়ে খাঁজ প'ড়ে কড়া পড়ে, তাঁর ঘাড়েও তেমনি কঠিন চামড়ার তিনটে খাঁজ ছিল। দেহে তাঁর মেদবাহুল্য ছিল চরম; এত-বড় দেহ এক আমেরিকার বিখ্যাত বলী ল্যাম্বার্ট ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো

হয়নি। কিক্কড় ল্যাম্বার্টের চেয়ে দীর্ঘতর ছিলেন, তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে-ছয় ফুটের ওপর, অবশ্য আমি নিজে মেপে দেখিনি। লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ভাল ছিল না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্ম্মুখ। তাছাড়া তাঁর টাকার প্রতি দারুণ টান ছিল। শোনা যায় যে, টাকার জন্য তিনি সময়ে সময়ে অনুপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হার স্বীকার করতেন।

গামা-ইমামের দেহ মেপেছি ব'লে ফাঁকি দিয়ে আমি কিক্কড়ের বুক মেপেছিলাম। তোমরা সে মাপের কথা বিশ্বাস করতে পারবে কি? মাপটি ছিল পুরো আশী ইঞ্চি। ল্যাম্বার্টের ছাতির মাপও তাই ছিল। কিক্কড়ের ঘাড় ও উরু মেপে দেখবার আমার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। এত বড় বুকের মাপ আর কোন মানুষের হয়নি; এর পরেই যা সব-চেয়েও বড় সাধারণ ছাতির মাপ ছিল, তা গুলামের—৫৮ ইঞ্চি।

বিখ্যাত মল্ল আহ্‌মদ বখ্‌শের নাম তোমরা শুনেছ। তাঁর বড় ভাই মীরান বখ্‌শও খুব নামজাদা মল্ল ছিলেন। এঁরা গামার এক আখাড়ার লোক এবং গামারই মত মাধো সিংএর শিষ্য। মীরান বখ্‌শ এইসময়ে রেওয়া রিয়াসতে কাজ করতেন। তাঁর সঙ্গে কিক্কড়ের এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে কুস্তি হ'ল। মনে হ'ল, কিক্কড়ের সঙ্গে মীরানকে লড়িয়ে যেন বিরাট একটা ঠাট্টা করা হচ্ছে। মীরানের এমন ক্ষমতা ছিল না যে, জমি থেকে কিক্কড়ের একটা পা তোলেন। কিন্তু কুস্তি আরম্ভ হবার একটু পরেই কিক্কড় ধরাশায়ী হলেন। আমার মেকলের কবিতা মনে পড়ল—

And the great Lord of Luna
Fell at that deadly stroke,

As falls on Mount Alvernus
A thunder-smitten oak !

কিক্কড়ের পতনে সকলেই আশ্চর্য্য হ'ল এবং অবাক্ হ'ল। যে কিক্কড়কে চারজন পহলবানের সমবেত শক্তি জমি থেকে নড়াতে পারত না, সেই কিক্কড় মীরানের সামান্যতম চেষ্টায় এক বগলি প্যাঁচের বলে চিৎ হয়ে গেলেন! জনরব বলে, কিক্কড় অনেক টাকা নিয়ে পরাজিত হতে সম্মত হয়েছিলেন। কিক্কড়ের সঙ্গে লড়ার নামে গুলামের মুখ পাংশু হয়ে যেত, মীরান তাকে অবলীলায় হারিয়ে দিলেন! কিক্কড়ের এইটাই বোধহয় শেষ কুস্তি। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

কিক্কড়-বিজয়ী মীরানের তখন গামার সঙ্গে লড়বার কথা, কিন্তু গুরুভাই ব'লে মীরান লড়লেন না, কাজেই গামা হলেন 'রুস্তম-ই-হিন্দ', কুস্তির জগতে যার চেয়ে আর বড় পদবী নেই, যা ছেড়ে পঞ্জাবী কোন মল্ল 'রুস্তম-ই-জহাঁ' অর্থাৎ পৃথিবীর চ্যাম্পিয়নও হতে চায় না।

পাঁচ

রামমূর্ত্তির নাম অনুকরণ ক'রে সে-সময়ে ভারতীয় বলী সম্প্রদায়ে কয়েকটি 'মূর্ত্তির' উদয় হয়েছিল। লছমন মূর্ত্তির উল্লেখ আমি করেছি; আর যে ব্যক্তিটি ক্ষণিকের জন্য কতকটা খ্যাতিলাভ করেছিল তার সার্কাসী নাম ছিল, ইসলামমূর্ত্তি। এই 'মূর্ত্তিটি'র মধ্যে অসাধারণ কিছু ছিল না। ইসলামমূর্ত্তি অওরঙ্গাবাদ শহরের লোক, দেশী ফৌজী হাসপাতালের আই. এম. ডি. ডাক্তার। তার শক্তি এমন ছিল না যাতে রামমূর্ত্তির সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করতে পারত; কিন্তু রেষারেষির উত্তেজনায় এবং মুসলমান সমাজের আংশিক পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামমূর্ত্তির নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। সে বার বার রামমূর্ত্তিকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করত এবং রামমূর্ত্তি তাকে প্রথমে অগ্রাহ্য করতেন ব'লে কিছু কিছু লোকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, ইসলাম-মূর্ত্তি তাঁকে পরাজিত করতে পারে।

রামমূর্ত্তি যখন লাহোরে গেলেন, সেখানকার দর্শকেরা তাঁকে খুব আদর করেছিল। তারা রামমূর্ত্তিকে হাতীর পিঠে চাপিয়ে বিরাট একটা মিছিল বার করেছিল এবং তাঁকে অনেক উপঢৌকন দিয়েছিল। ইসলামমূর্ত্তিও রামমূর্ত্তির পিছনে পিছনে লাহোর গিয়েছিল, এবং সেখানকার অনেকে রামমূর্ত্তির দেখাদেখি ইসলামমূর্ত্তিকেও হাতীর পিঠে চাপিয়ে মিছিল বার করেছিল।

এলাহাবাদ প্রদর্শনীতেও এই ইসলামমূর্ত্তির আগমন হ'ল।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে তার খেলা দেখতে গেলাম, কিন্তু এমন কিছু দেখা গেল না যা মনের ওপর কোন দাগ দিতে পারে। ইসলামমূর্ত্তি যা করত, তা আজকাল অনেক সাধারণ ব্যায়ামী করতে পারে।

এই ডাক্তারটি খেলার মাঝে রোজ রামমূর্ত্তিকে চ্যালেঞ্জ করত। একদিন শোনা গেল, রামমূর্ত্তি তার চ্যালেঞ্জ স্বীকার করেছেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং এলেন না, এল রামমূর্ত্তির সুবিখ্যাত শিষ্য পৃথ্বীরাজ; তার একহাতে একটা হাজার টাকার নোট, অন্য-হাতে একটা লোহার শিকল। সে ইসলামমূর্ত্তি ও দর্শকদের চীৎকার করে বল্লে যে, শিকলটা ইসলামমূর্ত্তি যদি ভাঙতে পারে, রামমূর্ত্তি পরাজয় স্বীকার করবেন ও এই হাজার টাকা তাকে দেবেন। ইসলামমূর্ত্তি শিকল ভাঙতে স্বীকৃত হ'ল না। তখন পৃথ্বীরাজ সেই শিকল ভাঙা ছাড়া এই মেকী বলীর অধিকাংশ কসরতের পুনরাবৃত্তি করলেন। দর্শকদের ঠাট্টা-চীৎকারে ইসলামমূর্ত্তি খেলার প্রাঙ্গণ ছেড়ে পালালো, এবং সেই হ'ল তার ক্ষণিক বলীজীবনের অবসান।

যে-সময়ের কথা বলছি, সে-সময়ে ইংলণ্ডে অনেক নামজাদা বলী ছিল। এদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠতম, তারা সকলেই জাতিতে স্কচ। উইলিয়ম ব্যাঙ্কিয়ার ছিল এই দলের সব-চেয়ে নামজাদা ব্যক্তি। তার চমৎকার অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য লোকে তার নামকরণ করেছিল, 'অ্যাপলো'। ব্যাঙ্কিয়ার জনসমাজে অ্যাপলো নামেই পরিচিত ছিল, তার আসল নাম খুব কম লোকেই জান্‌ত। অ্যাপলোর লেখা একখানি ব্যায়ামের বইয়ের সেকালে খুব প্রচলন ছিল। তা থেকে এই জানতে পারা যায় যে, ভারোত্তোলনের দ্বারা সে তার দেহ চমৎকার ক'রে

গড়েছিল। অ্যাপলো এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে কয়েকদিন নিজের কসরৎ দেখিয়েছিল। তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, বুকের ওপর দীর্ঘকাল ধ'রে একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো রাখা।

অ্যাপলো হাত-পা মাটিতে রেখে ঊর্দ্ধমুখ ক'রে নিজের দেহটাকে 'ব্রিজ'এর অবস্থায় রাখলে এবং তার দেহের ওপর বিরাট একটা প্ল্যাটফর্ম রাখা হ'ল। প্ল্যাটফর্মের ওপর বৃহৎ গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটি স্থাপিত হ'লে একটি মহিলা পিয়ানো বাজাতে বসল, আর দু'জন পুরুষ বাদক বেহালা নিয়ে দাঁড়াল। খানিক সময় ধ'রে এই তিন-জনে মিলে দীর্ঘ একটি গৎ বাজালে। অ্যাপলোর বুকের বোঝার অনুমিত ওজন ছিল সর্ব্বসুদ্ধ ৫০০০ পাউণ্ড।

প্রায় সব য়ুরোপীয় বলীরা কসরৎ দেখাবার সময়ে দর্শকদের উৎসাহিত করবার জন্য তাদেরই মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। অ্যাপলোরও একটা পাঁচমণী ময়দার বস্তা ছিল—এই ধরণের প্রতি-যোগিতার জন্য। সেদিন অ্যাপলো ঘোষণা ক'রে দিলে যে, যে ব্যক্তি ওই বস্তাটা মাটি থেকে তুলতে পারবে, সে পাঁচশত মুদ্রা পুরস্কার পাবে।

অনেক ভারতীয় বলী সেখানে জড় হয়েছিল, তাদের অনেকেই বস্তাটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করে হয়রাণ হ'ল। আমি বস্তা তোলার কায়দার কথা অ্যাপলোর বইতেই পড়েছিলাম, কাজেই সকলের চেষ্টা যে বৃথা হবে সে-কথা আমার জানা ছিল। অবশেষে একটা বিপুলকায় গোরা সৈনিক এসে বস্তাটাকে সোজা ক'রে সযত্নে দাঁড় করিয়ে দিলে; এইটুকুতেই আমার আর সন্দেহ রইল না যে, সে বোঝাটাকে তুলে ফেলবে। তারপর সে উপুড় হয়ে বস্তাটার গায়ে

গা দিয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে সেটাকে পিঠের ওপর নামিয়ে নিলে। পিঠের ওপর বস্তাটার যখন ভারের সমতা হ'ল, গোরাটা হামাগুড়ি দেবার মত ক'রে হাত-পায়ে ভর দিয়ে নিজের দেহ ও বস্তা ওপরে তুল্লে। বস্তা তোলার এইটাই বিশিষ্ট কায়দা এবং এই কায়দায় একজন বলবান ব্যক্তি পাঁচমণের চেয়ে ঢের বেশী ভার তুলতে পারে। অ্যাপলোকে পাঁচশোটি টাকা সেদিন দিতে হ'ল।

এর পর বস্তাটির আর কোন মর্য্যাদা রইল না, অনেক লোক সেটাকে তুলে দিলে এবং পারিতোষিকের হার দ্রুত পাঁচশো থেকে পঞ্চাশে এসে দাঁড়াল। কলিকাতায় ভীম ভবানী অ্যাপলোর বস্তা তুল্লেন, এবং অ্যাপলোর সব কসরতের পুনরাবৃত্তি করতে তিনি প্রস্তুত হতেই অ্যাপলো ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে। কিন্তু অ্যাপলোর জীবনীতে এ-সব কথার কোন উল্লেখ নেই।

এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে সমাগত প্রধান প্রধান বলীদের কথা আমি লিপিবদ্ধ করেছি। অন্য সকলের কথা মনে রাখা শক্ত কথা, কারণ, তাদের মনে রাখবার মত কোন বিরাট কীর্ত্তি আমি দেখিনি। এই বলীদের মধ্যে কেবল পরতাবা ছিল অঙ্গহীন। তার দেহে এইরকম খুঁত না থাকলে, সে যে খুব বড় মল্ল হতে পারত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্ত্তী কালে অন্য যে দোষযুক্ত মল্ল দেখলাম, সে গুঙ্গা। গুঙ্গা মূক ও বধির, কিন্তু তাতে তার কোন ক্ষতি হয়নি। গুঙ্গা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মল্ল; তার কথা তোমরা পরে জানতে পারবে।

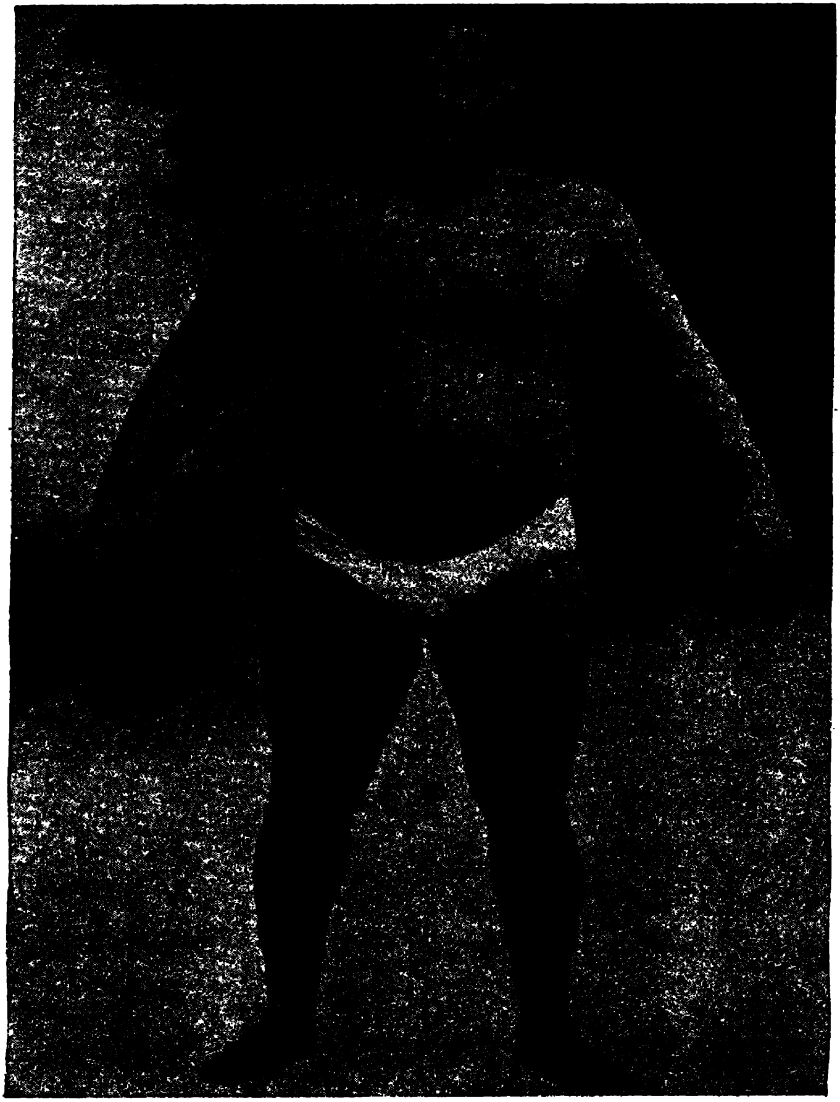

মহামল্ল গুলাম

ভারতীয় পহলবানেরা যাঁকে আজও দেবতাজ্ঞান ক'রে পূজা করে

ভীম ভবানীর নাম তোমরা সকলেই শুনেছ। তাঁকে বাংলাদেশের সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ বলী বলা যায়। ভবানীর বিবরণ সংবাদপত্রে প'ড়ে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে দেখতে আমি কোলকাতা যাই। ভবানীর সার্কাস খুঁজে বার করতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। সার্কাস-ক্ষেত্রের পাশের বাড়ীর লোকও আমাকে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভবানীকে দেখে সত্য আমার কষ্টের লাঘব হয়ে ছিল। তাঁর পূর্ব্বে জীবন পাঠক, কৃষ্ণ-

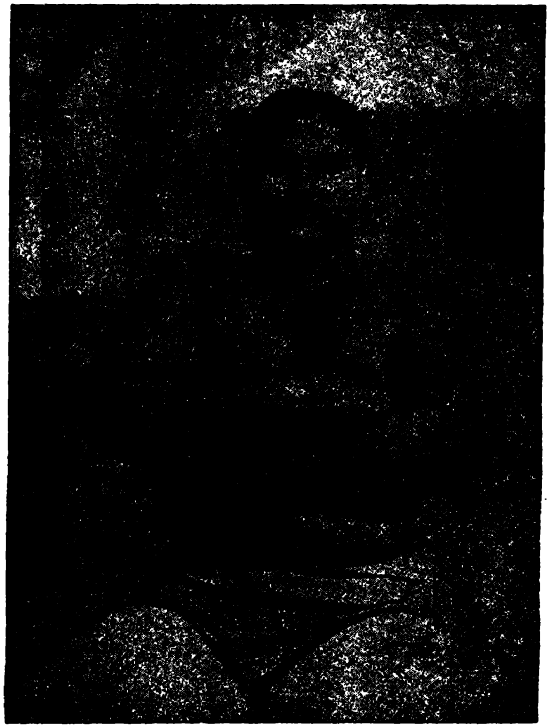

সর্ব্বকালের বাঙালী বলী
ভীম ভবানী

দাস শীল প্রভৃতি বাঙালী বলী দেখে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা হয়নি। ভবানীর ভিতর যে উপাদান ছিল, সে উপাদানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলীরা তৈরী হয়ে এসেছে। তাঁর দেহ ছিল যেমন বিরাট, দৈহিক ক্ষমতাও

ছিল অসাধারণ। তিনি ভারতীয় সার্কাসী বলীদের থেকে ভিন্ন ছিলেন এই হিসেবে যে, তিনি শক্তির পরিচয় দিতেন দু'রকমে। এক, পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত ভারসহনশীলতা দেখিয়ে, দ্বিতীয়, বিরাট ভার তুলে। দুটো হাতী বুকের উপর ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র ভবানীরই হয়েছিল। ভবানীর কসরৎ ছিল রামমূর্ত্তির ছাঁচে ঢালা, আমার চোখে ভবানীকে দ্বিতীয় রামমূর্ত্তি ব'লে মনে হয়েছিল। তিনি যে প্রাচ্য সকল দেশে বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন তার কারণ তাঁর শক্তির খেলাগুলিতে কোন চালবাজী ছিল না।

আমার ভবানীর প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণ, তিনি বারবেল-তোলার বিষয়ে আমার অগ্রণী। তাঁর পূর্ব্বে শুনেছি, ৺ক্ষেতু গুহ বারবেল তুলতেন। ভবানীও ক্ষেতুবাবুর মত গ্লোব বারবেল ব্যবহার করতেন, যা সেকালে চলন ছিল। ভবানীর শক্তি এবং বারবেল তোলার বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার সমন্বয় হ'লে তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলক হতে পারতেন, তাতে আর কারো সন্দেহ থাকলেও, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ভবানীর নামও যখন জানতাম না, অর্থাৎ তাঁকে দেখবার এক-বৎসর আগে থেকে আমার বারবেল তোলবার সখ হ'ল। তার কারণ হ'ল তিনটে, প্রথম, এলাহাবাদ প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে, রেল ষ্টেশনে হুইলারের বইএর দোকানে একদিন একখানা 'হেল্‌থ্ অ্যাণ্ড ষ্ট্রেংথ্' পত্রিকা পেলাম, তার প্রচ্ছদপটে ছিল হেকেন্‌স্মিথের ছবি, ভেতরে তার ও টমাস ইঞ্চ প্রভৃতির বারবেল-তোলার কাহিনী। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, অতর্কিত ভাবে স্যাণ্ডোর লেখা 'আইডীয়ল ফিজিক্যল ক্যলচর' ব'লে একখানা বই পাওয়া। গ্রিপ ডাম্বেল ও রবারের ডেভেলপার ইত্যাদি

বাজারে বার ক'রে স্যাণ্ডো এই বইখানির বিক্রি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন, কারণ, সেই বইতে স্যাণ্ডোর বারবেলের দ্বারা নিজের দেহ গঠন করবার কথা ছিল। তৃতীয় কারণ, মেজর ডোনাল্ডসন নামে এক ফৌজী অফিসরের বারবেল-তোলা দেখা। সখ ত' হ'ল, বারবেল আসে কোথা থেকে, তখন ও জিনিষটি ভারতবর্ষে পাওয়া যেত না। অথচ বারবেল অভ্যাস করতে আমার দেরী সইছিল না।

পাড়ায় একটা বুড়ো কামারের দোকান ছিল। সেই দোকানে কয়েকটা টিপিং ওয়াগনের অর্থাৎ মাটি বয়ে নিয়ে যাবার ছোট রেল-গাড়ীর চাকা ছিল। মধু অভাবে গুড় দিয়ে কাজ চালানোর ব্যবস্থা যেকালে আছে, বারবেল অভাবে সেই চাকা দিয়ে কাজ চালাবার ব্যবস্থা আমার সমীচীন বোধ হ'ল। অনেকবার তাড়া খেয়ে, অনেক হাতে-পায়ে ধ'রে বুড়োর অনুমতি পাওয়া গেল, এবং একদিন বুড়ো খুশী হয়ে নিরবধি কাল পর্য্যন্ত একটা চাকা বাড়ীতে এনে তোলবার কথা দিয়ে ফেল্লে। বলা বাহুল্য, সেই ৩৫ সের ওজনের চাকা তখনি বাড়ীতে স্থানান্তরিত হ'ল।

মেজর ডোনাল্ডসন এইসময়ে বিলেত যাবার ঠিক ক'রে নিজের সব জিনিষ পীক অ্যালেন কোম্পানীর হাতে তুলে দিলে, নীলাম করবার জন্য। আমি নীলামে গেলাম বটে, কিন্তু ধনী এক মুসলমান ভদ্রলোক মেজরের লোহা-লক্কড় সব কিনে নিয়ে আমাকে নিরাশ করলেন। নীলাম কোম্পানীর বড়বাবু আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বারবেলটা আমি দশ টাকায় পাব, কিন্তু বিক্রি হ'ল সেটা পঞ্চাশ টাকায়; কাজেই আমার চাকাটিই রইল একমাত্র ভরসা। সুখ দুঃখ যে চাকার মত পরিবর্ত্তন করে এ-বাক্যের সত্যতা সেইদিন

উপলব্ধি করলাম, যেদিন আমার পরিক্রমণশীল চাকার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বাবা আমার ঘরে এসে হঠাৎ বারবেল কিনে দেবার কথা দিয়ে ফেল্লেন, কিন্তু সর্ত্ত হ'ল, ওটার দাম পাব যেদিন আমার প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের খবর বেরোবে। ইতিমধ্যে আমি কোলকাতার ডব্লিউ লেস্‌লী কোম্পানীতে বিলেতে কোথা বারবেল পাওয়া যায় তার সমস্ত খবর দিয়ে ব্যাপারটাকে এগিয়ে রাখলাম। এই বারবেল পাবার পর এক বৎসরের ব্যবহারে আমার দেহের সে কি বিপুল পরিবর্ত্তন হয়েছিল তা বলতে পারি না। কিন্তু তখন আমি বারবেল দিয়ে ব্যায়ামই করতাম, ভার-তোলার কায়দা বিশেষ আয়ত্ত করতে পারিনি, বই প'ড়ে তা আয়ত্ত করবার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না, কাজেই ভবানীকে দেখতে ছুটেছিলাম যদি কিছু শিখতে পারা যায়। সে ইচ্ছা কিন্তু পূর্ণ হয়নি।

জারমান বলী ম্যাক্সিকের লিখিত ব্যবস্থায় বেশ এগিয়ে চলেছি, এমন সময়ে লক্ষ্ণৌএ এলেন বিখ্যাত রুষ বলী—ওয়ানা ক্র্যামার। লালবাগ ফুটবল মাঠের ধারে তাঁর তাঁবুতে গিয়ে এক সন্ধ্যায় হাজির হলাম। চারদিকে নানা আকারের বারবেল ছড়ানো, কিন্তু সেগুলো ছুঁতে প্রথমে ভরসা হ'ল না। একটু পরে বায়স্কোপ আরম্ভ হ'ল, সেই আমাদের প্রথম বায়স্কোপ দেখা। আমার মন কিন্তু পড়েছিল সেই বিরাট চেহারার বারবেলগুলোর ওপর। বায়স্কোপ বন্ধ হতেই আমি সেগুলো নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। এমন সময়ে ক্র্যামারের রুষ ম্যানেজারটি প্রচার করলে যে, সেদিন আসল কিছু হবে না, কারণ ক্র্যামারের জ্বর। লোক ক্ষেপে উঠল, কেউ ম্যানেজারকে মারতে যায়; কেউ বলে, তাঁবু পুড়িয়ে দেব। সে বেচারা ইংরেজী ত'

জানেই না, হিন্দিও বলে তথৈবচ, সে অনেক হাত-পা নেড়ে বোঝালে যে, সেদিনের টিকিটে, পরের দিনও ওদের ব্যায়াম-কৌশল দেখা চলবে। আমার কলেজের এক প্রফেসর সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ক্র্যামারের বারবেলের মাঝে আমাকে ঘুরতে দেখে সেগুলো তোলবার চেষ্টা করতে আমাকে হুকুম দিয়ে বসলেন। লজ্জা আর ভীতি কেটে যাবার পর চেষ্টা করা গেল, এবং সেই ভীতিপ্রদ বড় বড় ষ্টেজ-বারবেলগুলো অনায়াসে তুলতে পারলাম, কারণ, তাদের চেহারার মত ভার ছিল না। একটা নিরীহদর্শন বারবেল কিন্তু মাটি থেকে নাড়ানো গেল না।

পরের সন্ধ্যায় দেখি, দীর্ঘকায় এক ভীমদর্শন সাহেব তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। সেকালে আমার বুকের ব্যাজটি বিশেষ ক'রে য়ুরোপীয় বলী-সমাজে প্রবেশ করবার ছাড়ের নিদর্শন ছিল, কাজেই ক্র্যামারের সঙ্গে আমার দর্শন মাত্রেই আলাপ হয়ে গেল। আমি যে পূর্ব্বরাত্রে তাঁর ভারগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম, সে খবর ক্র্যামার পেয়েছিলেন, খুশী হয়ে বল্লেন, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি বল?' আমি প্রথমতঃ গোটাকয়েক কায়দায় ভার তুলে দেখাবার ফরমায়েস করলাম, তারপর কিছু শিখতে চাইলাম। 'বেণ্ট প্রেস', 'টু হ্যাণ্ডস্ এনি হাউ', প্রভৃতি অত্যন্ত শক্ত কায়দাগুলি যত্ন ক'রে দেখলাম, তারপর অনেক-কিছু শিখলাম, সেই আমার প্রথম হাতে-কলমে শিক্ষা। সেই রাত্রে ক্র্যামার পেশীসঞ্চালন দেখালেন। তখনকার কালে সুপুষ্ট বলবান ব্যক্তিরাই পেশীসঞ্চালন করতেন, এখনকার মত প্রত্যেক দুর্ব্বল, নড়বড়ে, রোগা, রাম শ্যাম ও-কাজ করত না।

ক্র্যামার ভাল কুস্তিগীরও ছিলেন, কিন্তু তা হ'লে কি হয়, ভারতীয় কোন মল্লকে আয়ত্ত করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। এলাহাবাদে রেওয়া রাজার কুঠিতে ক্র্যামার পীরা বখ্‌শের সঙ্গে লড়লেন। পীরা প্রথম-শ্রেণীর পহলবান না হলেও সুচতুর মল্ল ছিলেন, খ্যাতিও তাঁর কম ছিল না। পাঁচ মিনিটে ক্র্যামারের কুস্তির সাধ মিটে গেল। এই ব্যাপারের পর ক্র্যামারের আর কোন সংবাদ পাইনি।

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে খেয়াল হ'ল, বক্সিং শিখব, কিন্তু খেয়াল হলেই ত' হয় না, তখন ও-বিদ্যা শুধু এ-দেশের ইংরেজ সৈনিকেরাই জানত। কলকাতায় গেলাম। একদিন ধর্ম্মতলায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম, হার্ট ব্রাদার্সের আড়গোড়ার ওপরতলায় বিখ্যাত ডিক্সি কিডের বক্সিং স্কুলের সাইনবোর্ড। কোন চিন্তা না ক'রে আমি ডিক্সি কিডের কাছে উপস্থিত হলাম। তার চেহারা দেখে আমার মনে ভয় হ'ল, মুখে দু'তিন জায়গায় আঘাতজনিত ক্ষতের ওপর স্টিকিং প্ল্যাস্টর লাগানো, দেহ যেন লোহার তারের সমষ্টি দিয়ে তৈরী। কাঁধের আর বাহুমূলের গঠনে মনে হ'ল, আঘাত করবার শক্তিতে ও বাহু দুটি battling ramকেও হার মানায়। আমি অবাক হয়ে খানিক তাকে দেখে নিজের উদ্দেশ্যের কথা বল্লাম। আমাকে শিক্ষার্থী জেনে এই নিগ্রো ওস্তাদের খুব ফুর্ত্তি হ'ল। আমাকে বসবার জায়গা দিয়ে সে বল্লে—বাংলাদেশের কেন্দ্র এই কোলকাতা শহরে আমি এতকাল রয়েছি, কিন্তু বাঙালী শিক্ষার্থী তুমি প্রথম, আমি বিনা পয়সায় তোমাকে শেখাব। অবশেষে আমার পীড়নে একটা দামের রফা হ'ল। কিন্তু আমি যখন বল্লাম যে, আমার মাত্র দু'মাস কলেজ বন্ধ, তারই ভেতর যা শেখবার শিখব, ডিক্সি কিড ঘর ফাটিয়ে হেসে বল্লে, 'মাই

ডিয়ার বয়, আমি ৪৫ বৎসর বয়সে যা সম্পূর্ণ শিখতে পারলাম না, তুমি দু'মাসে তা আয়ত্ত করবে।' যাহোক, কথা হ'ল, পরের সপ্তাহে আমার শিক্ষা আরম্ভ হবার ব্যবস্থা হবে, আমি কয়েকদিনের জন্য গেলাম মামার বাড়ী এক পল্লীগ্রামে। কোলকাতায় ফিরতে বাবার তার পেলাম—'বাড়ী এস।' ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরলাম, বক্সিং শিখে নয়, ম্যালেরিয়া নিয়ে। এই ডিক্সি কিড নিজের যৌবনকালে খুব খ্যাতিসম্পন্ন মুষ্টিযোদ্ধা ছিল। আমেরিকায় থাকবার কালে সে ছিল, ভুবনবিখ্যাত ওস্তাদ জ্যাক জনসন, জো জিনেট, হ্যারি উইলস্ প্রভৃতি নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাদের সঙ্গী, এটা অবশ্য আমার শোনা কথা।

বাবার আফিসে সার্জ্জেণ্ট ডয়েল ব'লে এক গোরা কাজ করতেন। তিনি ছিলেন ভারতের ওয়েলটর ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন। আমি তাঁকে পাকড়াও করলাম। ডয়েল শুধু মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন না, চমৎকার কুস্তিগীরও ছিলেন। তাঁকে দু'জন মুসলমান ওস্তাদ কুস্তি লড়াতো। তাঁর পরিবার বলতে তিনি, দুটি গ্রে হাউণ্ড কুকুর ও একটি দুগ্ধবতী গাভী। বলা বাহুল্য, ঘরের সব দুধটুকু প্রভু আর কুকুর মিলে পান করতেন। ডয়েলের মত পাঞ্জার শক্তি আমি আর কারো দেখিনি বল্লেই চলে। আজ পর্য্যন্ত কোন বলীকে টেনিস বল ছিঁড়তে দেখিনি বটে, কিন্তু ডয়েলকে বহুবার আঙুলের চাপ দিয়ে টাকা ও ডবল পয়সা বাঁকাতে দেখেছি। ঘোড়ার লোহার নাল ত' তিনি অজস্র ভেঙেছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় কাপ্তেন পদে উঠেছিলেন। আমার কপালে কিন্তু ডয়েলের কাছে বক্সিং শেখা হ'ল না। সময় নেই ব'লে ডয়েল আমাকে এক ফৌজী ব্যায়ামাগারে সমর্পণ করলেন। যে রাক্ষসের হাতে আমি পড়লাম, সে আমার মন থেকে ভয় দূর ক'রে

দিলে বটে, রোজ ঘুঁসিয়ে রক্তাক্ত ক'রে—কিন্তু শেখালে না কিছুই। শেখবার বয়সটা আমার অতীত হয়ে গেল ব'লে আজও আমার আফশোষ যায়নি।

আমাদের পাড়ায় খুশীরাম ব'লে এক ধনী জমিদারের বাড়ীতে কুস্তির আখাড়া ছিল, সেখানে দু'জন বাঙালী কুস্তি শিখে বেশ খ্যাত হয়েছিলেন, একজন মন্মথবাবু, অন্যজন বখ্তাওর খাঁ। সেই আখাড়ায় দশরথ ব'লে এক পহলবান ছিল, এবং বাইরের নামজাদা অনেক মল্ল মধ্যে মধ্যে আসত। দশরথের বাহুর মত গোঁফও ছিল বিরাট, তার তুলনা করা যেত রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়ে রুষ নৌবাহিনীর নেতা অ্যাড্মিরল ম্যাকারফের গোঁফের সঙ্গে! আমরা দশরথকে তা নিয়ে ঠাট্টা করতাম। দশরথ আমার বারবেল তুলতে পারত না বলেই হোক, বা মল্লদের ভার-তোলার প্রতি কোন দরদ নেই বলেই হোক্, আমাকে বলত—'ও কুলির কাজ ছাড়, কুলিতে বোঝা বয়, পহলবান বয় না।' কিন্তু কুস্তি ভালবাসলেও লড়বার সাহস আমার হয়নি। কারণ, একবার গোপনে দিনকয়েক লড়ে ধরা প'ড়ে গিয়ে বাবার কাছে বকুনি খেয়েছিলাম প্রচুর। তিনি কুস্তিটা প্রীতির চোখে দেখতেন না। কারণ, সব আখাড়াতেই যে-দরের লোক যেত, তারা ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গী হবার উপযুক্ত নয়, এই ছিল তাঁর ধারণা।

এই আখাড়ায় অহ্মদ ব'লে একটি গরীব ছেলে ছিল। অপূর্ব্ব ছিল তার কুস্তি লড়ার কায়দা আর অঙ্গসৌষ্ঠব। তাকে আমি মাঝে মাঝে কিছু দিতাম। এই ছোকরার অত্যন্ত উন্নতি হ'ল যখন শাহ্দীন এলেন খুশীরামের আখাড়ায়। শাহ্দীন নিজেকে গামার গুরুভাই

বলতেন এবং বেশ নামজাদা মল্ল ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল গল্পকথার রাজপুত্রের মত, একটু খুঁত ছিল, ভুঁড়িটি ছিল ব'লে। শাহ্‌দীন আমাকে কুস্তি লড়তে উত্তেজিত করতেন। বার বার বলতেন—'বেটা, গায়ের জোর নিয়ে কি হবে! যে লড়তে জানল না, সে পুরুষই হ'ল না কোনকালে।' আমার উপায় ছিল না, নতুবা এমন সুযোগ সকলের ভাগ্যে হয় না। অহ্‌মদ শাহ্‌দীনকে খোসামোদ করত আমাকে তার সঙ্গে লড়তে রাজী করবার জন্য। আমার বল পরীক্ষা করবার নেশা ওকে চেপে ধরেছিল। একদিন অহ্‌মদকে খুসী করবার জন্য লড়তে তৈরী হলাম। আখাড়ার ফটক বন্ধ হ'ল, ভেতরে আমরা দু'জন ছাড়া রইলেন, শাহ্‌দীন ও দশরথ। আমাকে ধরা মাত্র অহ্‌মদ চিৎপাত ক'রে ফেলে দিলে। কৌশলী কুস্তিগীরের কাছে যে গায়ের জোর কিছু নয়, আমার সে ধারণার প্রমাণ পেলাম। শাহ্‌দীন আমার পিঠ চাপড়ে বল্লেন—'বেটা, যুদ্ধ-কৌশলের কাছে গায়ের জোরের দাম দুটো কড়িও নয়, এইবার কুস্তি ধর।' সবই জানতাম, উত্তর আর কি দিব!

এ-প্রদেশে নাগপঞ্চমীর দিনে যে মেলা হয়, তাকে 'গুড়িয়া' বলে। এই মেলার দিনটা লোকে শক্তির চর্চ্চা করে। সকাল থেকে প্রত্যেক আখাড়ায় কুস্তি হয়, এবং বিকেলে মেলার ক্ষেত্রে অনেক লোক পাথর অথবা পাথরের তৈরী 'নাল' তোলে। এ-ধরণের কোন উৎসব বাংলাদেশে নেই। গুড়িয়ার দিনে হিন্দু মুসলমান কুস্তিগীরেরা একসঙ্গে লড়ে আনন্দ করে। লক্ষ্ণৌতে দু'চারজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকেও আমি এ উৎসবে যোগ দিতে দেখেছি। আমরা অনেক আখাড়া থেকে নিমন্ত্রণ পেতাম, সব আখাড়ায় ঘুরেঘুরে সারাদিন কুস্তি

দেখতাম ও পান এলাচ চিবোতাম। কারণ, আমাদের দৌড় ওই পর্য্যন্ত। কসাইবাড়া ব'লে একটা পল্লীতে একটা আখাড়া আমাকে অত্যন্ত আকর্ষণ করত। কারণ ছিল সেখানকার প্রৌঢ় ওস্তাদ। সে একজন সুঠাম কুস্তিগীর। সেই লোকটি জাতে ছিল 'খটিক', অর্থাৎ যারা ডিম, মুরগী ইত্যাদি বেচে, কিন্তু সে তা না ক'রে বাজারে একটা তরকারির দোকান রাখত, এবং তার দোকানে খরিদ্দারের ভীড় হ'ত সবচেয়ে বেশী। তার কারণ কি জান? তার দেহ এত সুন্দর ছিল যে, লোকে তাই দেখতে তার দোকানে যেত। সে খালি-গায়ে দোকানে বস্‌ত। তার ওপর লোকটা ছিল অত্যন্ত মিষ্টভাষী। সুঠাম দেহসম্পন্ন লোক এ-দেশে যে কি রকম জনপ্রিয় হয়, এই ব্যক্তিটি ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রৌঢ় ওস্তাদের কথা যা বলেছি, সে ছিল আমার চোখে অতিমানুষ। ওসব আখাড়াগুলোয় নানা আকারের মুগুর থাকত, এই আখাড়ায় একজোড়া ছিল, তাতে অনেক লোহার বেড় দেওয়া। আমি তখন ২০০ পাউণ্ড বারবেল অবলীলায় যখন-তখন তুলতে পারতাম, কিন্তু ওই জোড়াটার একটা মুগুরও সোজা ক'রে ধরতে পারতাম না। ওস্তাদ কিন্তু ওই জোড়াটা কতবার ৪০।৫০ বার ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। সে হাসত আর বলত, 'বাবুজী, বাঙালীর বদনাম ক'রে দিলে। কোলকাতার অম্বুবাবু, সোল্‌হা সাল কা বচ্চা, এইসব মুগুর ঘুরিয়ে গেছেন, যেখানে-যেখানে তিনি বেড়াতে গেছেন।'

রামমূর্ত্তির অনেক শিষ্য ছিল, তার মধ্যে অর্জ্জুন সিং ব'লে একজন লক্ষ্ণৌ শহরে থেকে গিয়েছিল এবং জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য স্কুল-

গুলিতে ও অন্যান্য জায়গায় নিজের ব্যায়ামকৌশল দেখাতো। সে আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল, বারবেলের ব্যায়াম ক'রে গায়ে জোর বাড়াতে। গায়ে অবশ্য তার যথেষ্ট শক্তি ছিল, কিন্তু এতটুকু তার বুদ্ধি ছিল না। সে ১২৫ পাউণ্ড বারবেল তুলতে হিমশিম খেয়ে যেত। তারপর ছ'মাসে কোন উন্নতি হ'ল না দেখে সে পালিয়ে গেল। কয়েক বৎসর পরে আমি তাকে হঠাৎ দেখলাম গিরিডিতে এক ক্ষুদ্র সার্কাসে। রামমূর্ত্তি যে-সব করতেন, সে-সকলের অধিকাংশ ব্যায়াম সে করলে, কিন্তু বারবেল-তোলা তার অনায়ত্তই থেকে গেল।

খুশীরামের আখাড়া, ভৈরোঁনাথ মহাদেবের মন্দির প্রভৃতি অনেক স্থানে পাথরের নাল ছিল। উত্তরপ্রদেশের মল্লেরা মাঝে মাঝে শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য নাল তোলে ; পঞ্জাবে কিন্তু আমি এ-প্রথা দেখিনি। গায়ে জোর হয়েছে মনে ক'রে একদিন ভৈরোঁনাথের নাল তুলতে গেলাম, কিন্তু লাভ হ'ল এই যে, অনায়ত্ত নালটা হাত ফস্কে প'ড়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছেঁচে দিলে। আমার কিন্তু জেদ চেপে গেল। দুপুরে কলেজ থেকে ফেরবার পথ ঘুরে প্রায়ই নির্জ্জনে নালটা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতাম। অবশেষে সেটা আমার আয়ত্তাধীন হয়ে গেল। কিন্তু এক-হাতে সেটাকে আমি কোনদিন তুলতে পারিনি, আজ পর্য্যন্ত কেউ পেরেছে ব'লে শুনিনি। নালগুলো যে খুব ভারী হয় এমন কথা নয়, কিন্তু সেগুলো এমনভাবে তৈরী যে, ভাল ক'রে ধরা যায় না। তাছাড়া, নাল ব্যালান্স করার কায়দা, বারবেল থেকে ভিন্ন। দশরথ, শাহ্‌দীন প্রভৃতির সঙ্গে আমার ভাবের কারণ ওই 'নাল'। একদিন আমরা দশরথের সঙ্গে গল্প করছিলাম, আমার এক

বন্ধু আমাকে দেখিয়ে বল্লে, 'ওস্তাদ, এর সঙ্গে লড়বে?' দশরথ অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লে,—'এক্ তো বঙ্গালী, দুসরা বচ্চা, লড়ব কি!' পিঠ চাপড়ে বল্লে, 'বাবুজী, রাগ কোরো না, বাঙ্গালীদের গায়ে জোর হয় না।' কোন উত্তর না দিয়ে আমরা তাকে জপিয়ে আমার বাড়ী নিয়ে এলাম। বারবেল দেখিয়ে বল্লাম, একবার তুলে দেখ ত' বাবাজী! সেই ১৩০ পাউণ্ড বারবেল কর্ত্তার দ্বারা উঠ্‌ল না, আমি সেটা প্রথমে ডান-হাতে, তারপর বাঁ-হাতে তুলতে, দশরথ হাঁ ক'রে রইল, খানিক পরে বল্লে, 'আমার কথা প্রত্যাহার করলাম।' তখন সে আমায় খুশীরামের বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে গেল! শাহ্‌দীন প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমাকে নালটা দেখিয়ে বল্লেন, ওটা তুলতে পারলে তোমাকে মালাই খাওয়াব, ওটাকে এখানকার খুব কম লোকেই তুলতে পারে। প্রথমে দু'হাতে তাকে ওপরে তুল্লাম, তারপর কাঁধ পর্য্যন্ত আবার দু'হাতে তুলে, ডান হাতে আবার সেটাকে ওপরে তুল্লাম। তখন থেকে শাহ্‌দীন ও দশরথ আমার বন্ধু হলেন।

এই সূত্রে লক্ষ্ণৌয়ের আর-একটি আশ্চর্য্য লোকের কথা বলি। ভজ্জা খাঁ এককালে ছিল পেশাদার পহলবান, কিন্তু পহলবানীর চেয়েও তার মালিশ করার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি তার নাম শুনেছিলাম মাত্র, একদিন ফুটবল খেলায় পা মচকে তার আশ্রয় নিতে হ'ল। যখন তার বাড়ী গেলাম; তখন সেখানে অসম্ভব ভীড় ছিল, একের পর এক ব্যক্তির ব্যথার স্থান নিয়ে ভজ্জা তখন ব্যস্ত। মালিশও করছে, অনর্গল কথাও কয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আমার পালা এলো এবং তার মালিশ করার কায়দা দেখে তার ওপর আমার ভারী

ভক্তি হ'ল, তখনই সঙ্কল্প করলাম, যে-করেই হোক ওর ও-বিদ্যাটা শিখতে হবে। বড় হয়ে পলহবান-সমাজে দেখেছি, সকলেরই একজন ক'রে মালিশ করবার লোক থাকে, যাকে বলে মালশিয়া, ইংরেজিতে যাকে masseur বলা যায়। এসব লোকেরা শুধু তৈলমর্দ্দন করার ওস্তাদ নয়, মচকানো, হাড় স'রে যাওয়া, ভাঙ্গা প্রভৃতির ব্যবস্থাও এরা ক'রে থাকে। দেহের অস্থি, শিরা ও বাত-নাড়ীর সংস্থাপনার বিষয়ে ওদের কিছুই জানা থাকে না, কিন্তু ওরা যখন আঙুল চালায়, কেউ বলতে পারে না যে, ওদের শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। ভুলচুক যে এরা করে না এমন নয়, কিন্তু ভুল ততটাই করে, যতটা কৃতবিদ্য লোকেও ক'রে থাকে। ভজ্জার কিন্তু ভুলের বালাই ছিল না। কয়েক বৎসরের মধ্যে একবার আমি ওকে ভুল করতে দেখেছি মাত্র। ভজ্জা খাঁর বাড়ী আমি অনেক ধরণা দিয়েছি, ওকে খুশী করতে অর্থব্যয় করেছি, কিন্তু কিছুই আদায় করতে পারিনি। ওসব লোকেরা নিজের বিদ্যা অপরকে বিন্দুমাত্র শেখাতে যে কত নারাজ তা কি বলব! কিন্তু ভজ্জার গুণ ছিল অসীম। কোনদিন হয়ত খুশী হয়ে আমাকে শেখাবে এই মনে ক'রে আমি নিরাশ হয়েও ওকে ছাড়তে পারতাম না। ওর গুণের একটা উদাহরণ দিই। এক রবিবার বিকেলবেলা ওর কাছে ব'সে আছি, এমন সময় দুটি বাঙালী ভদ্রলোক একটি এগারো-বারো বৎসরের ছেলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ভজ্জার কাছে এলেন। প'ড়ে গিয়ে ছেলেটির ডান হাতের কব্জির হাড় স'রে গেছে, হাড় উঁচু হয়ে রয়েছে আর ছেলেটি অসহ্য বেদনায় ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মত বেঁকে পড়ছে। শুনলাম, সকালে এই দুর্ঘটনা হয়েছে, শহরের কোন ডাক্তার কিছু করতে পারেন নি, অবশেষে এক বাঙালী ডাক্তার, ভদ্রলোককে

ভজ্জার কাছে পাঠিয়েছেন। ছেলেটির হাত পরীক্ষা ক'রে ভজ্জা দুটো পয়সা চাইলে। ও আগেথেকেই দক্ষিণা চাইছে ভেবে ভদ্রলোক দুটি টাকা বার করলেন, ভজ্জা হেসে ব'ল্লে—'টাকা আমি নিইনে, পয়সা দুটোও এখনি ফেরৎ দেব।' পয়সা দুটো ভজ্জা ছেলেটির কব্জির দুপিঠে রেখে আঙুলের চাপ দিলে। খুট্ ক'রে হাড় স্বস্থানে ব'সে গেল। হাল্কা ব্যাণ্ডেজ ক'রে সে ছেলেটিকে ছেড়ে দিলে, দিন-কয়েকে সে আরামও হয়ে গেল। বিলাতের ভুবনবিখ্যাত বার্কার সাহেব ভজ্জার মতই bone-setter, কিন্তু বার্কার সাহেব ধনী ব্যক্তি, নাইট উপাধি ভূষিত। ভজ্জা গুণ সত্ত্বেও গরীবই রয়ে গেল। ডাক্তারেরাও যে তার সাহায্য নিতেন না, এমন নয়। সে মালিশ ক'রে পয়সা নিত না, কি ক'রে যে তার চলত তা ভগবানই জানেন, অন্য কাজ-কর্ম্ম করবার তার সময়ও ছিল না।

ছয়

একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়ে পথে একজন বলিষ্ঠদর্শন লোক দেখলাম। তার অভিনব পোষাকটি হ'ল তার ওপর আমার দৃষ্টি পড়বার কারণ। পায়ে পাম্প-শূ, লুঙ্গির মত ক'রে একটা পাড়হীন ধুতি-পরা। শক্ত-প্লেট শার্টের ওপর ড্রেস সূটের সোয়ালো-টেল-কোট-পরা। প্রথমে মনে হ'ল, মাদ্রাজীরা ধুতি পরে, খালি-পায়ে থেকেও কোট কলার টাই পরে। এমন কি, এক মাদ্রাজী জজ ওই বেশে বেঞ্চে বসতেন। তারপর মনে হ'ল, সার্কাসের বলীদের ও-ধরণের কোট-পরা একটা চলতি ফ্যাসান। তখনই গায়ে প'ড়ে লোকটির সঙ্গে ভাব ক'রে জানলাম, সে ব্যক্তিটি নামজাদা মাদ্রাজী বলী দোরাস্বামী আয়াঙ্গার, লক্ষ্ণৌতে নিজের ব্যায়াম-কৌশল দেখাতে এসেছেন; আস্তানা নিয়েছেন খুশীরামের একটা ভাড়াটে বাড়ীতে।

বলা বাহুল্য, দোরাস্বামীর বাড়ীতে আমাদের যাতায়াত আরম্ভ হ'ল। তখনও তাঁর সার্কাসের মালপত্র এসে পৌঁছোয়নি। বাড়ীতেই তাঁর অনেক ব্যায়াম দেখলাম। লোকটি ছিলেন সুচতুর জিমনাষ্ট, ব্যালান্সিং ও প্ল্যাঙ্কের কায়দাগুলি বেশ কৌশলযুক্ত ছিল। কিন্তু একটু বেশী ভাব হবার পর তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে গেলাম, কারণ, তিনি যখন-তখন রামমূর্ত্তির নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন। আমার এক বন্ধু ছিলেন নির্ম্মলবাবু, তাঁর কব্জিতে অসাধারণ শক্তি ছিল। কনুই টেবিলের ওপর রেখে তাঁর সোজা-হাত কেউ বড় সহজে

নোয়াতে পারত না। দোরাস্বামী একদিন রামমূর্ত্তির বুকে হাতী রাখার কথায় বল্লেন যে, ওটা মেয়েলি-কসরৎ, তিনি ইচ্ছা করলে যে-কোন স্ত্রীলোককে দিয়ে ও-কাজ করাতে পারেন। আমরা দোরাস্বামীকে জব্দ করবার ফন্দী আঁটলাম। প্রথমে ভার-তোলা দিয়ে তাঁকে ফ্যাসাদে ফেলা গেল, তারপর তাঁকে খুব তাতিয়ে, নির্ম্মলবাবুর ফাঁদে ফেল্লাম। নির্ম্মলবাবুকে জব্দ করা ছিল তাঁর ক্ষমতার অতীত, কব্জি লড়তে গিয়ে দোরাস্বামী বার বার নির্ম্মলবাবুর দ্বারা পরাজিত হলেন।

দোরাস্বামীর সার্কাসের প্রথম রাত্রে তাঁর যে কৌশল দেখলাম, তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দোরাস্বামী উপুড় হয়ে হাত দুটো লম্বা ক'রে শুলেন। তাঁর উপুড়-করা পুরোবাহুর ওপর পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে স্তূপাকার করা হ'ল। সে স্তূপের উচ্চতা হ'ল ছ'ফুটের ওপর। সেই শায়িত অবস্থা থেকে দোরাস্বামী ধীরে ধীরে দেহ উঁচু ক'রে, টাইগার বেণ্ড অর্থাৎ শর্ট আর্ম ব্যালান্সের অবস্থায় গিয়ে স্থির হলেন, এবং একটু পরে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে গেলেন। এই অমানুষিক কসরতে একটি পাথরও স্থানচ্যুত হওয়া দূরে থাক, সামান্য মাত্র নড়ল না। এ-ধরণের ব্যায়াম আমি আজপর্য্যন্ত কাউকে করতে দেখিনি। এটাতে শক্তির পরিচয় না থাকলেও, সহ্যশক্তি ও অসম্ভব পেশীশাসনের পরিচয় ছিল। দোরাস্বামী বাহু দুটি সম্পূর্ণ সোজা রেখে, প্ল্যাঙ্কও করতে পারতেন।

লক্ষ্ণৌ হকি খেলার কেন্দ্র হবার পূর্ব্বে খুব বড় একটা ফুটবলের আড্ডা ছিল, এবং সেখানে অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড়ও ছিল। স্কুলে-

স্কুলে সব রকম খেলার যে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা হ'ত, তাতে নিত্য নূতন খেলোয়াড় তৈরী হ'ত বটে, কিন্তু একদল বয়স্থ পাকা খেলোয়াড় নূতন ছেলেদের পথ আট্‌কে থাকত। প্রতিযোগিতার নিয়মে ষোল বছর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেরা সব টীমে স্থান পেত, কিন্তু প্রত্যেক স্কুলে একটা ক'রে খেলাড়ী দল থাকত, যাদের বয়স চিরকালই ষোল বছর থাকত, তারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ঠাকুর্দ্দার বয়সী ছিল! একটা স্কুলে ছিল, লালগীর ও ফিদা হুসেন ব'লে দু'জন লোকও আমাদের সঙ্গে ছিল, সুচারু মুখোপাধ্যায় ব'লে আর-এক জন। লালগীর একালের লোক হ'লে, কোলকাতার ফুটবল মাঠ অলঙ্কৃত করত। তার মত সেণ্টার ফরোয়ার্ড আমি আজপর্য্যন্ত দেখিনি, এমন কি, গোরাদের দলেও নয়। সে ছিল জাতিতে লালবেগী মেথর, গোরাবারিকে চাকরি করত আর গোরাদের সঙ্গে সারাদিন ফুটবল পিট্‌ত। বহুকাল সে লক্ষ্ণৌতে ফুটবল খেলেছে, অবশেষে মোরাদাবাদ পুলিশ স্কুলের এক বিলেতি ইণ্টারন্যাশনাল খেলোয়াড় তাকে জখম ক'রে তার খেলার সর্ব্বনাশ ক'রে দেয়। ফিদা হুসেন চমৎকার হাফ ব্যাক খেলত। সেকালের ফুটবলে অত্যধিক মারামারি করতে হ'ত, সেই আবহাওয়ায় থেকেও ফিদা মারামারি না ক'রে সুনিপুণ খেলা খেলত। সুচারুর মত চৌকশ খেলোয়াড় একালেও বিরল। চমৎকার হকি ফুটবল খেল্লেও, ক্রিকেটে তার বোলিং ছিল ভীতিপ্রদ। একবার বাৎসরিক টুর্ণামেণ্টে তার জন্য প্রতিপক্ষদলের মাত্র দু'রাণ হয়েছিল। তাছাড়া দৌড়োনো, লাফানো ইত্যাদিতে তার যোগ্য প্রতিপক্ষ কোথাও ছিল না।

স্যার মহারাজ সিং, যিনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধি হয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ছিলেন, তিনি খুব বড় ফুটবল ও টেনিস খেলোয়াড়

ছিলেন। এই দুই খেলায় তিনি অক্সফোর্ডের 'ব্লু' হয়েছিলেন। কোন দেশী লোক আজপর্য্যন্ত তাঁর মত হাফ ব্যাক হয়নি। তিনি টেনিস খেলায় অনেকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন, সে-সময়ে টেনিসে এত ভারতীয় খেলোয়াড়ের ছড়াছড়ি ছিল না। তাঁর ভগ্না রাজকুমারী অমৃত কুঁয়র তখন একমাত্র ভারতীয় মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। ভাইয়ের সঙ্গে তিনি কয়েকবার সিমলা ব্লেসিংডন টুর্ণামেণ্টে মিক্স্ড্ ডব্ল্স্ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

কুঁয়র ও মহারাজ সিং যে-টীমে খেলতেন, সেই টীমের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ছিলেন লক্ষ্ণৌ তালুকদার স্কুলের প্রিন্সিপাল ডেভিস সাহেব। তিনি বিলেতে থাকতে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে খেলতেন, পরে ইণ্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতাতেও খেলেছিলেন। তাঁর খেলা খুবই চমৎকার ছিল। সেই টীমের ব্যাক ছিলেন, তালুকদার-স্কুলের একজন শিক্ষক শম্ভুনাথ, তাঁকে আমরা জায়ণ্ট বলতাম; যেমন বল কাড়বার, তেমনি বিরাট কিক্ করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। কিন্তু এই টীমের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন ছিল, এমাদ-উল্-ইসলাম। রেলের টীমে আর-একজন ইণ্টারন্যাশনাল খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁর নাম—ইভান্স। তিনি বল ও মানুষ সবই ঠেলে নিয়ে চলে যেতেন।

এমাদ আমার সহপাঠী ও বন্ধু। তাঁর মত নিপুণ চৌকশ খেলোয়াড় আমি আর দেখব ব'লে আশা করি না। খেলবার ক্ষমতা তাঁর ভগবানদত্ত ছিল। যেমন সুশ্রী চেহারা, তেমনি ছিল তাঁর খেলবার স্টাইল। খেলবার সময়ে তাঁর খোলা উরু যে দেখেছে, সেই মুগ্ধ হয়েছে। উরু দুটি যেমন পেশল, তেমনি ছিল তাদের শক্তি। এমাদ দশ সেকেণ্ডে একশো গজ দৌড়তে পারতেন, ছ'ফুট হাইজাম্প ও

প্রায় ২৩ ফুট লঙ্‌জাম্প করতেন। ১৬ পাউণ্ড লোহার গোলা বিনা অভ্যাসে তিনি ৪০ ফুট দূরে ফেলেছিলেন। কুস্তিও তিনি লড়তেন চমৎকার। টেনিস, ফুটবল, হকি, ক্রিকেট তিনি চমৎকার খেলতেন, কিন্তু এ-সকলের মধ্যে তাঁর ফুটবল খেলা ছিল অতুলনীয়। আর-একটি বিশেষ গুণ ছিল যা অন্যের হওয়া অসম্ভব। ধনী লোকের ছেলে বলেই এমাদের সেটা শেখা সম্ভব হয়েছিল। সেকালে 'বিম্বট' বলে আত্মরক্ষা আর আক্রমণের বিশেষ ধারা ছিল, এখন চর্চ্চার অভাবে সেটা লোপ পেতে বসেছে। বিম্বটের উৎপত্তি, ঠগীদের যুগ থেকে। একটা মস্ত রুমালের এক কোণে একটা টাকা কি একটা ডবল পয়সা বেঁধে সেকালের ঠগীরা তার দ্বারা মানুষ মারত, সেই রুমাল ঘুরিয়ে প্রতিপক্ষের লাঠি, বর্শা ইত্যাদিও কেড়ে নিত। এমাদ এই বিম্বট শিখেছিলেন, অবশ্য শেখার খাতিরে। এমাদ কোলকাতা গিয়ে বাইটন, লক্ষ্মীবিলাস কাপ প্রভৃতিতে হকি খেলেছেন, তাঁর কাছে বাইটনের দুটো ও লক্ষ্মীবিলাসের একটা বিজেতার মেডেল্ আছে।

আমাদের পরবর্ত্তী কালের নামজাদা খেলোয়াড় হলেন, হাবুল বাঁড়ুয্যে। লক্ষ্ণৌয়ের রামলাল কাপ যখন ফুটবলের প্রতিযোগিতা ছিল, তার শেষ বৎসর হাবুল ফুটবল খেলেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভা ছিল, হকি খেলায়। তাঁকে তোমরা প্রৌঢ় বয়সে কোলকাতায় খেলতে দেখেছ। তাঁর যৌবনকালে অলিম্পিক গেম্‌সে টীম পাঠাবার ব্যবস্থা থাকলে, হাবুলের ভুবনজোড়া খ্যাতি হ'ত। তাঁর কালের আরো দুটি চমৎকার হকি খেলোয়াড়, শৌকত আলি ও গফ্‌ফারের মধ্যে শৌকত কোলকাতায় চাকরি করতেন ব'লে খুব পরিচিত হয়ে গেছেন।

গফ্‌ফারের খেলা লাহোরের সুবিখ্যাত খেলোয়াড় পেনিঙ্গারের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা যেতে পারত।

লক্ষ্ণৌতে হকি খেলার উৎকর্ষের কারণ আমার বন্ধু, সুচারু দে। তিনি খুব চমকপ্রদ খেলা খেলতে পারতেন না বটে, কিন্তু খেলোয়াড় তৈরী করবার তাঁর অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল। হাবুল, শৌকত, গফ্‌ফার, ওসমান, গজনফর প্রভৃতি তার প্রমাণ। এমন কি, এমাদের মত লোকও সুচারুর শিক্ষায় উন্নতি করেছিলেন। এই যুগের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী কালে উত্তরপ্রদেশের শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় ছিলেন, আসদ হুসেন দিবই ও আলিগড়ের আসদ আলি। আসদ আলি খেলা পড়তির সময়ে কলকাতায় 'কাস্টম্‌স' টীমে কিছুদিন খেলেছিলেন। আজকের ধ্যানচাঁদ কোন-অংশে আসদ হুসেন, আসদ আলি ও হাবুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নন।

সুচারুর পরিবার প্রকৃতপক্ষে ব্যায়ামী পরিবার, কারণ তিনি ও তাঁর অন্য চার ভ্রাতা ব্যায়ামী ও অনন্যসাধারণ দৈহিক উৎকর্ষ ও শক্তির অধিকারী। হকি, ফুটবল খেলা ছাড়া সুচারু ভাল কুস্তিগীরও ছিলেন। সেকালে লক্ষ্ণৌয়ের অধিকাংশ বাঙালী যুবকই শক্তির চর্চ্চা করতেন।

সাত

সাধারণতঃ অনেক স্ত্রীলোককে সার্কাসে নানা ব্যায়াম করতে আমরা মাঝে মাঝে দেখি বটে, কিন্তু পুরুষালি মাপকাঠিতে কোন স্ত্রীলোকের গায়ে যে শক্তি থাকতে পারে এ-কথা আমরা মনেও করতে পারিনে। তবুও মাঝে মাঝে এমন সব রমণীদের কথা আমরা শুনতে পাই, যাঁদের ব্যতিক্রম ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় রমণীদের ভেতর এইরকম দু'টি স্ত্রীলোকের কথা আমি জানি, একজনের নাম, রুক্মাবাঈ। ইনি দক্ষিণ ভারতের লোক, কুস্তি লড়ে প্রভূত দৈহিক শক্তি সঞ্চয় করেছেন। আমি তাঁর ছবি মাত্র দেখেছি। অন্যজন, তারাবাঈ। ইনিও দক্ষিণ ভারতের লোক। তাঁর শক্তির খেলা আমি বহুবার দেখেছি। রমণী ব্যায়াম করলে যে রুক্ষ হয়ে যায় না, তারাবাঈ তার প্রমাণ। ভারতীয় রমণী হিসাবে তাঁর দেহ বিরাট, কিন্তু অত্যন্ত সুঠাম ও সুশ্রী ছিল। তাঁর মূর্ত্তিতে রমণীসুলভ লাবণ্যের কোন অভাব ছিল না। তারাবাঈকে বিখ্যাত জারমান-রমণী কেটি স্যাণ্ডবিনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কেটি সুবিখ্যাত ভারোত্তোলক, অনায়াসে ২৮৬ পাউণ্ড বারবেল মাথার ওপর তুলতে পারে, কিন্তু এই গুরুব্যায়াম সত্ত্বেও কেটির অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্য ছিল। গঠনের দিক দিয়ে, তারাবাঈএর বিষয়েও ঠিক সেই কথা বলা যায়।

ভারতীয় পুরুষ বলীদের প্রথা অবলম্বন ক'রে তারাবাঈ ভার-সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। পিঠের ওপর গুরুভার পাথর

রাখা, বুকের ওপর পাথর ভাঙানো, উরু ও বুকের ওপর দিয়ে বোঝাই গাড়ী চালানো প্রভৃতি তারাবাঈ নিত্য দেখাতেন। এই কসরতের কোনটাই কোন বলশালিনী রমণীর পক্ষে অবহেলার ব্যাপার নয়। কিন্তু এইগুলি তারাবাঈএর বিপুল খ্যাতির কারণ ছিল না, খ্যাতি হয়েছিল অন্য কারণে, যাতে শক্তির পরিচয় ছিল অল্পই। তারাবাঈ কোমরে খুব মোটা ও চওড়া চামড়ার বেল্ট্ বেঁধে আসরে আসতেন। একটা চওড়া তক্তায় ক্ষুরধার একটা বর্শা সোজা ক'রে আট্-কানো থাকত। তারাবাঈএর লোকজন তাঁকে এই বর্শার শাণিত

তারাবাঈ

মুখের ওপর শুইয়ে দিত, শরীর থেকে বর্শার ব্যবধান ওই চামড়ার বেল্ট্। তারাবাঈ এই অভিনব শরশয্যায় খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতেন। তাঁর এই খেলার আজ পর্য্যন্ত নকল হয়নি।

অন্য একটি খেলায় একটা কাঠের পাটাতনের ওপর মানুষ-বোঝাই

একটি গাড়ীর সম্মুখদিকে একটা বর্শা আট্‌কানো থাকত। দর্শকেরা বর্শার ফলাটা পরীক্ষা ক'রে দেখে যেত যে, তা' দিয়ে অনায়াসে মাথা কামানো যায়। তারাবাঈ মাথার সিঁথি বর্শায় লাগিয়ে হাত পিছনে রেখে অনায়াসে গাড়ীটা পাটাতনের শেষপর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতেন। তাঁর মূর্ত্তির তাতে কোন পরিবর্ত্তন হ'ত না, কেবল কুমারী তারাবাঈএর সিঁথিতে সিঁদুরের বিন্দুর মত একটা ক্ষীণ রেখা শোভা পেত।

শাণিত অস্ত্র নিয়ে খেলার কথায় আমার আর-এক ব্যক্তিকে মনে পড়ল, কিন্তু তার নাম আমার স্মরণ নেই। লক্ষ্ণৌতে আমাদের বাড়ীর খুব কাছে খানিকটা মাঠ ছিল, সেটা আমাদের পল্লীর লোকের চলাচলের পথ ছিল। মাঠটার একধারে একটা বৃহৎ অশথ গাছ ছিল। একদিন সকালে দেখলাম, সেখানে একটা ছোট তাঁবু খাটিয়ে একটা লোক আস্তানা করেছে। পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রী ও ছোট একটি মেয়ে ও একটা টাট্টু ঘোড়া। লোকটি সেইখানেই থাকত, সে যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি তা আমরা কোনওরকমে জানতে পারিনি। একদিন সে আমাদের কাছে প্রস্তাব করলে যে, সে কিছু পেলে, খেলা দেখাতে পারে। তার আধ-পাকা চুল আর রোগা চেহারা দেখে বিশেষ ভক্তি হ'ল না, তবু সাহায্য করবার হিসাবে তাকে মাত্র তিনটি টাকা দেবার কথা হ'ল। লোকটি জাতিতে রাজপুত। অভাবগ্রস্ত লোক, ওই তিন টাকাতেই সে খুশি হ'ল; কিন্তু তার খেলা যে অবিশ্বাস্য ধরণের হবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

একটা ছুটির দিনে এই রাজপুতের খেলা দেখবার ব্যবস্থা হ'ল। সরঞ্জামের মধ্যে সে চাইলে ছোট-বড় দুটো দড়ির খাটিয়া ও একটা মুদীর দোকানের একমণী ওজন। খাটিয়া দুটোতে সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে সে একটু দূরে দূরে রাখলে। তারপর একরাশ অস্ত্র বার করলে; বর্শার ফলা, তীরের ফলা, ক্ষুর ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে, তার প্রত্যেকটা দিয়ে হত্যা করা চলে। বড় খাটিয়াটিতে সেই অস্ত্রগুলি সযত্নে সাজিয়ে রেখে রাজপুতটি এক কৌপীন প'রে এলো। সে বল্লে যে, অস্ত্রগুলি বড় খাটিয়ায় যে-পর্য্যায়ক্রমে সাজানো আছে, এক নূতন উপায়ে ছোট খাটিয়ার ওপর সেগুলি ঠিক সেই পর্য্যায়ে সাজিয়ে রাখবে। নূতন উপায় কি হ'ল, জান? পা দুটি ঊর্দ্ধে তুলে অর্থাৎ 'লং আর্ম্ ব্যালান্স' ক'রে সে বড় খাটিয়ায় উঠল এবং ঠোঁট দিয়ে একটা অস্ত্র তুলে সেই অবস্থাতেই নেমে এসে ছোট খাটিয়াটায় অস্ত্রটি রাখলে। এইরকমে দেড় ঘণ্টার ওপর সময়ে সে সব অস্ত্রগুলি স্থানান্তরিত করলে। এই সময়ের ভেতর সে এক সেকেণ্ডও বিশ্রাম করেনি, বা পা মাটিতে নামায়নি, এবং তার ঠোঁটের চামড়াও কোথাও কেটে যায়নি!

তারপর সে ক'ড়ে আঙুলে সেই একমণ ওজনটা ঝুলিয়ে তিনশত গজ আন্দাজ দূর একটা স্থান পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এলো। শিখেরা মাথায় যে কৃপাণ বাঁধে, সেইরকম একটা কৃপাণ তার অস্ত্র সংগ্রহের ভেতর ছিল। হাতার নিমগাছটার একটা মোটা শাখা আমরা দেখিয়ে দিলাম, সে সেই শাখাটায় কৃপাণটা ছুঁড়ে মারলে। মনে হ'ল, কৃপাণটা মাটিতে পড়ার অনেক পরে কর্ত্তিত শাখাটা মাটিতে পড়ল, সেটা যেন কেউ সযত্নে করাত দিয়ে কেটেছে। লোকটির বয়স তখন ৪৫ বৎসর।

তার সঙ্গে খুবই ভাব হ'ল। একদিন কথায় কথায় রাজপুতটি বল্লে, দাঁত দিয়ে সে টাট্টু ঘোড়াটাকে মাটি থেকে তুলতে পারে। দন্তপংক্তিতে তার অনেকগুলি ফাঁক, কথাটা বিশ্বাস হ'ল না। আমি খুব খোশামোদ লাগিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে তার চ'লে যাবার সময় হ'ল, একদিন বল্লে, ঘোড়া তোলা তোমাকে না দেখিয়ে যাব না। আমি তাকে দুটি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি জানালাম। একদিন সকালে সে এসে বল্লে যে, দুপুরে একা এসো; কাজেই কলেজ পালাতে হ'ল। টাট্টুটার পিঠে নেওয়ারের পটি বেঁধে সে একটা নির্জ্জন গলির ভেতর সেটাকে নিয়ে গেল, সঙ্গে এলো ল্যাহাঙ্গা-পরা, ঘোমটা-ঢাকা ওর স্ত্রী। রাজপুতটি বল্লে, ওর দাঁত নেই, কাজেই ঘোড়া তুলবে অন্য লোক। ওর স্ত্রীর ঘোমটা ঘোড়ার পিঠের বন্ধনী পর্য্যন্ত নেমে গেল, খানিক পরে ঘোড়ার চারটি পা মাটি থেকে ওপরে উঠল। ওই কাপড়ের বস্তার ভেতর মানুষ ছিল কি দৈত্য ছিল তা আজপর্য্যন্ত জানিনে। ভগবান জানেন, রাজপুত মেয়েদের ঘাড় পিঠ কোমর পাথর দিয়ে, আর দাঁত ইস্পাত দিয়ে তৈরী কি না! সেদিন মা'র ভাণ্ডার থেকে প্রচুর চাল ডাল ইত্যাদি চুরি ক'রে এই অদ্ভুত দম্পতিকে দেবার সময়ে আমি পাপ করছি ব'লে মনে হয়নি।

আমি 'বিম্বট' দেখেছিলাম লুকিয়ে। আগেকার কালে ঠগীরা এই উপায়ে নিঃশব্দে মানুষ মারত, সেই কারণে এ-বিদ্যাটা ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, বিম্বট জটিল জিনিষ, ওর দ্বারা অস্ত্রধারী মানুষকে নিরস্ত্র করা যায়, হাড় ভাঙা, দম বন্ধ ক'রে দেওয়া ছাড়া—মানুষ মারা ত' যায়ই।

অনুসন্ধান ক'রে ক'রে জানলাম যে, একজন পাঠান একাওয়ালাও

এ-বিদ্যাটি জানে। নানা লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে এবং গাড়ীর আড্ডা ঘুরে ঘুরে একদিন সেই বিশেষজ্ঞকে আবিষ্কার করা গেল। লোকটা আমাকে যেস্থানে যেতে বল্লে, সেটা একটা খারাপ পল্লী, চোর গুণ্ডা সেখানে থাকে বলেই জানা ছিল। দু'টাকা দর্শনী দিতে হবে, আগে থেকেই কথা হয়েছিল, আমি তা সঙ্গে নিয়ে একদিন চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম। সেখানকার বিকটদর্শন লোকগুলোকে দেখে সত্যই ভয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বিশেষজ্ঞটি আমাকে অত্যন্ত যত্ন করেছিল। বোধহয় আমার আগে সখ ক'রে কেউ তার বিদ্যা দেখতে চায়নি।

আমি একটি খাটিয়ায় বসলাম। ওস্তাদ একটা লাঠি এনে একটা লোকের হাতে দিলে এবং নিজে খুব বড় একটা রঙিন রুমালের খুঁটে আমার একটা টাকা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। অন্য লোকটা তাকে লাঠি মারলে ও চক্ষের নিমেষে লাঠিটা তার হস্তচ্যুত হ'ল। নানা-রকম কায়দায় ওস্তাদ লাঠি কাড়লে, তারপর একবার লাঠি না কেড়ে, লোকটির কব্জির কাছে রুমাল জড়িয়ে দিয়ে তাকে একেবারে কাবু ক'রে দিলে ও আমাকে বল্লে, আর একটু টান দিলেই ওর হাড় ভেঙ্গে যাবে। তলোয়ার বা বর্শা আর কোথায় পাওয়া যাবে, লাঠি দিয়েই সে সব দেখাতে লাগল। অবশেষে সে অন্য লোকটার গলায় রুমাল জড়িয়ে নিমেষের মধ্যে ভূপতিত করলে। আর-একটু জোর টান দিলে তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে যেত।

এই কায়দা একবারই দেখেছি, কিন্তু তার তথ্য কিছু বুঝতে পারিনি, কারণ সেটা ছিল আমার দেখার বয়স, বোঝার বয়স নয়। এইমাত্র দেখেছিলাম যে, কোনবার ওস্তাদ লক্ষ্যচ্যুত হ'ল না, যেখানে

রুমাল জড়াবার, ঠিক ততটুকু স্থানেই জড়িয়ে দিচ্ছিল অসম্ভব রকম ক্ষিপ্র হাতে। টান দেবার মাত্রাও তার সাময়িক প্রয়োজনের বেশী হচ্ছিল না। কত কম-টানে যে কাজ হয় সে অনুভূতির অভিজ্ঞতা আমি কিছুদিন পরেই অর্জ্জন করেছিলাম, কাজেই ও-কথাটা বলতে পারি।

ফাউ হিসাবে সেই ওস্তাদ আমাকে লড়বার কায়দা দেখালে, অবশ্য আমি আরো অনেক জায়গায় পাঞ্জা-লড়া দেখেছি।

দিনকয়েক ডবল পয়সা-বাঁধা একখানা বড় রুমাল আমার সঙ্গী হ'ল এবং বন্ধুরা সেটার কারণে বিরক্ত হয়ে উঠল। এক ছুটির দিনে এক বন্ধুর বাড়ীর রকে জমায়েৎ হয়ে আমাদের গল্প চলছে, আমি হঠাৎ একজনের গলা লক্ষ্য ক'রে রুমাল ঘোরালাম। রুমাল গলায় জড়িয়ে যেতেই বন্ধু রক থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। তাড়াতাড়ি রুমাল খুলে নিয়ে দেখি তার জ্ঞান নেই। অল্প টানেই এই দুর্ঘটনা, হঠাৎ যদি আনাড়ি-হাতে টানটা বেশী হয়ে যেত তাহ'লে নরহত্যার পাপ আমার ঘাড়ে চাপত! বলা বাহুল্য, জন্মে আর কখনো ও বিপজ্জনক রুমাল নিয়ে খেলা করিনি।

একদিন লক্ষ্ণৌ থেকে এলাহাবাদে আসছি। গাড়ীতে অসম্ভব ভীড়। ঘুরে ঘুরে দেখলাম, একটা ইণ্টার ক্লাসে এক অতিকায় হাইল্যাণ্ডর গোরা একা ব'সে আছে। সঙ্গী বন্ধুর নিষেধ সত্ত্বেও আমি সেই গাড়ীতে উঠে পড়লাম। আমার বুকের বিলাতি ব্যাজটা দেখে গোরাটি হাত বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'জনেই এক সংঘের সভ্য, কথা কইবার আগেই আমাদের ভাব হয়ে গেল। খানিক আলাপের পর আমি শুনে আশ্চর্য্য হলাম যে, সে একদিনও কোন ব্যায়াম করেনি,

কেবল নিজের দলে ফুটবল খেলে। সে লোকটির নাম এখন আমার ঠিক মনে নেই, বোধহয় হুইলার। সে লম্বা ছিল সাড়ে ছ'ফুটের ওপর এবং তার মত অত মোটা হাড় আমি আর কখনো দেখিনি। তখনকার দিনে দেহ মাপবার একটা ফিতা আমার পকেটেই থাকত, আমি হুইলারের হাতের কব্জি দেখে আকৃষ্ট হয়ে মাপলাম। কব্জির মাপ হ'ল পুরো দশ ইঞ্চি। ভারতীয় যত-বড় বলীদেরই মাপি না কেন, কারো কব্জির মাপ সাড়ে আট ইঞ্চির বেশী দেখিনি। ওয়ানা ক্র্যামারেরও কব্জির মাপ ন' ইঞ্চির কাছাকাছি ছিল। অত মোটা কব্জি আর মোটা পায়ের গাঁট শুধু য়ুরোপের কিছু কিছু জাতির হয়ে থাকে, আমাদের দেশে হয় না। তার কারণ প্রকৃতিগত।

হাইল্যাণ্ডর গোরারা ডোরা-কাটা কম্বলের কিল্ট পরে, তা তোমরা দেখেছ। ওই বিশেষ কম্বলের নাম, টার্টান এবং ডোরাগুলিরও বিশেষত্ব আছে। আমরা যেমন নিজেদের গোত্রের পরিচয় দিয়ে থাকি, টার্টানও হাইল্যাণ্ডদের গোত্রের পরিচায়ক, ডোরা দেখে ওরা বুঝতে পারে, কে কোন গোত্রের লোক। স্কচেরা এই গোত্রকে 'ক্ল্যান' বলে। আমি অবশ্য টার্টানের বিষয়ের মূল কথাটা জানলেও, ডোরা চিনতাম না, কখনো চিনি না। হুইলারের অত-বড় শরীর দেখে জানতে ইচ্ছা হ'ল সে কোন ক্ল্যানের লোক। বোধহয় তার ক্ল্যান ছিল, ম্যাকটাভিশ।

হুইলারের সঙ্গে আর দেখা না হলেও, বহুকাল আমাদের মধ্যে পত্রের ব্যবহার ছিল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ বাধলে তার রেজিমেণ্ট দানাপুর থেকে ফ্রান্সে চলে যায়, তারপর হুইলারের আর কোন খবর পাইনি।

আট

গোবরবাবুর নাম তোমরা শুনেছ। তাঁর কথা বলতে গেলে আমাদের বাল্যকালের কথা বলতে হবে। বাল্যকালে আমি কলকাতা মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র ছিলাম। তার আগে আমরা আগ্রায় ছিলাম কিছুদিন। বাবা সেখান থেকে বদলি হয়ে উত্তর-চীনদেশে গেলেন, আমি কলকাতায় এসে ঐ স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলাম। ক্লাসে গোবরবাবু ও আমি পাশাপাশি বসতাম। গোবরবাবু তখনই বেশ গোলগাল মোটা ছিলেন, তাঁদের বাড়ীতে যে কুস্তির আড্ডা ছিল, তাও জানতাম, কিন্তু কোনদিন সেখানে যাইনি। গেলে বোধহয় অম্বুবাবুকে না হলেও, ক্ষেতুবাবুকে দেখতে পেতাম, যা না পাওয়ার জন্য আজও আমার আফশোস আছে।

সে-কথা থাক। আমাদের ক্লাসের মাষ্টার ছিলেন, হরিবাবু। তিনি ইংরেজী, অঙ্ক ইত্যাদি পড়াতেন, এবং বাংলার ইতিহাস ও উপক্রমণিকা পড়াতেন, জয়গোপাল পণ্ডিত। পণ্ডিতমশায় বেশ লম্বা-চৌড়া লোক ছিলেন। তাঁর মত মাষ্টারের হাতে আর কখনো পড়িনি। হরিবাবু মাঝে-মাঝে আমাদের পিটতেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে দয়া ছিল, মার-ধোর করাটাও নৈমিত্তিক ছিল। জয়গোপালবাবুর কিন্তু ও-বিষয়ে ভুলচুক ছিল না। কারণ থাক বা না-থাক, রোজ ছাত্র ঠেঙানো তাঁর চাই! অবশ্য এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, এ-বিষয়ে তিনি সমদর্শী

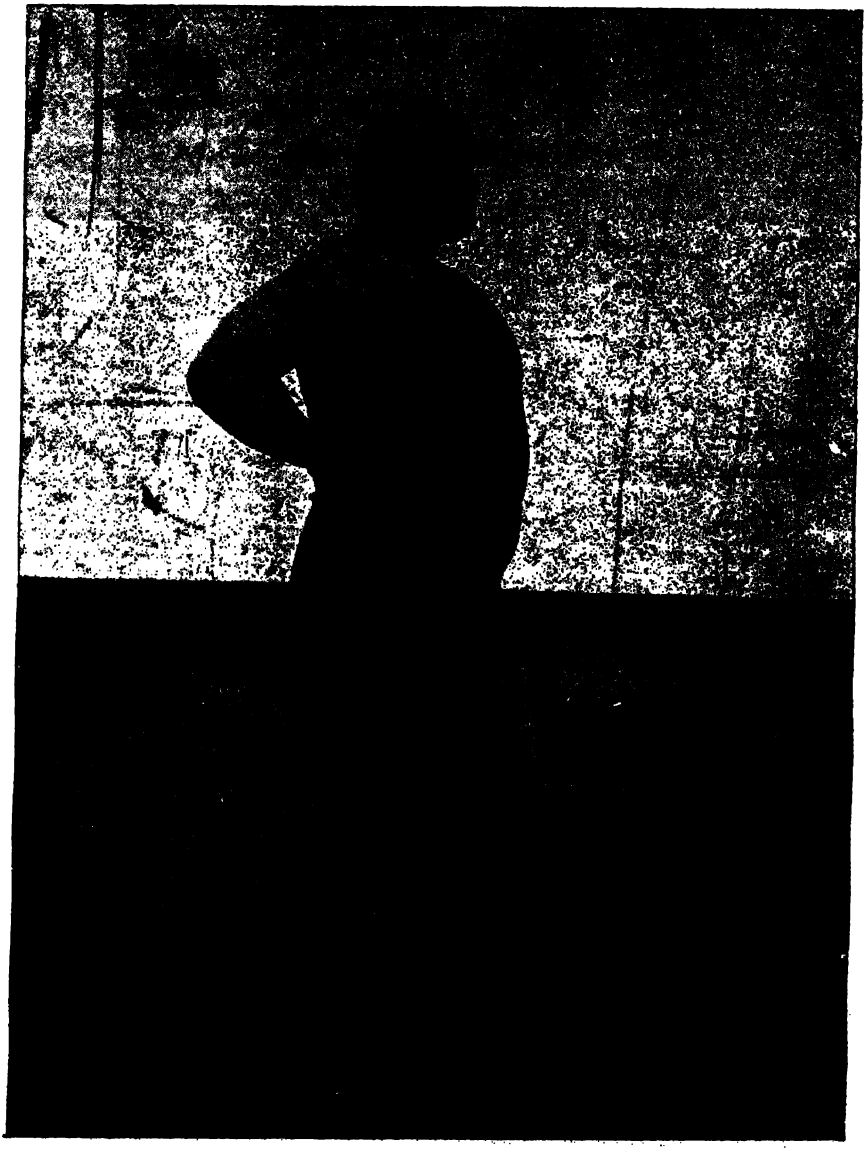

গোবর বাবু

ছিলেন, সকলকেই সমানভাবে অনুগ্রহ করতেন। পড়া ছাড়া মার খাবার অন্য একটি কারণ ছিল। ক্লাসের দুটো জানলায় আমরা রোদে দাগ দিয়ে রেখেছিলাম। দাগ দেখে নির্ণয় করা যেত কখন কোন্ ঘণ্টা—বিশেষ ক'রে পণ্ডিতমশায়ের ঘণ্টা কখন শেষ হবে। সেই দিকে চাইলেই প্রহার কিন্তু অব্যর্থ ছিল।

পণ্ডিতমশায়ের ছেলে-ঠেঙানোর কায়দা ছিল অত্যন্ত মৌলিক। যাকে তিনি মারবেন মনে করতেন, তাকে আগে বিন্দুবিসর্গ জানতে দিতেন না। একজনের দিকে চাইতে চাইতে তিনি আস্‌তেন, সে শশব্যস্ত হয়ে উঠত, কিন্তু মার পড়ত তার পাশের লোকের উপর।

আমি মারটা একটু কম খেয়েছিলাম ব'লে বোধহয় ছোট পহলবান রয়ে গেলাম, গোবরবাবু একটু বেশী খেয়েছিলেন ব'লে অত্যন্ত মজবুত হয়ে গিয়ে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেলেন! পণ্ডিতমশায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ বেশী করেই মজবুত ক'রে দিয়েছিলেন।

ছেলেবেলায় কতকটা সময় একসঙ্গে কাটলেও, বহুকালের অদর্শনে আমরা পরস্পরকে ভুলে গিয়েছিলাম। প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে আমি ও গোবরবাবু আবার নূতন ক'রে পরিচিত হয়েছি।

বাংলাদেশে শুধু নয়, স্মরণাতীত কালের সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে হিন্দু সমাজে ব্যায়ামচর্চ্চা অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তিনশো শতকের লেখাতেও আমরা এ ব্যবস্থার বিষয়ে জানতে পারি। বাংলাদেশের এককাল ছিল, যখন ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যত্ন ক'রে কুস্তি শিখতেন। কবি রবীন্দ্রনাথও বাল্য ও যৌবনে এ শিক্ষার হাত এড়াতে পারেন নি। মুক্তাগাছা নাটোর প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত

জমিদারেরা সুনিপুণ কুস্তিগীর ছিলেন। এখন আমরা ওটাকে ছোটলোক দরোয়ানের কাজ ব'লে মনে করি, অবস্থাও তাই তেমনি হয়েছে। ধনমান রক্ষা করতে গেলে আজ আমাদের ভাড়াটে লোকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

গোবরবাবুদের পরিবারেও তেমনি কুস্তির চর্চ্চা পুরুষানুক্রমে হয়ে এসেছে। এমন পরিবার খুব কমই পৃথিবীতে আছে, যাঁরা ব্যায়াম-চর্চ্চার পেছনে তাঁদের মত বিপুল অর্থ ব্যয় ক'রে আসছেন। গোবর-বাবুর পিতামহ অম্বুবাবু যেমন ধনী ছিলেন, কুস্তির সখও ছিল তাঁর তেমনি। তাঁর বলের খ্যাতি শুধু নিজদেশে আবদ্ধ ছিল না, উত্তর-ভারতের বলী-সমাজেও তিনি পরিচিত ছিলেন। এখনো বড় বড় পহলবানেরা তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর শক্তির কথা আগেই কিছু বলেছি। বাংলাদেশে যে নব-ব্যায়ামান্দোলন চল্‌ছে, প্রকৃতপক্ষে অম্বুবাবু তার উদ্যোক্তা। আমরা কেবল তাঁর কাজটাকে কতকটা পুষ্ট করছি মাত্র।

অম্বুবাবুর পর ক্ষেতুবাবু বড় বলী হয়েছিলেন। সেই হিসাবে গোবরবাবু বংশগত, অর্থাৎ পহলবানী-ভাষায় খানদানী পহলবান। এ-ধরণের বলীর উদাহরণ বাংলাদেশে আর নাই।

আগেই বলেছি যে, গোবরবাবু বাল্যকালে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন। তাহ'লেও তিনি যদি শরীরের স্বাভাবিক উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করতেন তাহ'লে তাঁর চেহারা অতি বিরাট হওয়া সম্ভব হ'ত না। গোবরবাবুকে দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, ক্ষুদ্রাস্থি, ক্ষুদ্রকায় বাঙালীও শারীরিক চর্চ্চা দ্বারা দৈহিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পারে।

সমগ্র ভারতবাসীদের যদি সব ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়,

তাহ'লে আমরা জানতে পারি যে, অনেক ব্যাপারের গোড়ার দিকে বাঙালীর হাত আছে। গামা ইত্যাদিকে ইংলণ্ডে নিয়ে গেছলেন গোবর-বাবু ও শরৎকুমার মিত্র। সেবার গোবরবাবু ইংলণ্ডে কিছু করেন নি। কয়েক বৎসর পরে তিনি কুস্তি লড়বার জন্য ইংলণ্ড গেলেন। তখন ও-দেশে ভারতীয় কুস্তিগীরদের খুব খাতির। সেখানকার লোকেরা ওঁর নাম রাখলে, "বয়-রেস্‌লর"। প্রথমে তিনি স্কটল্যাণ্ডের চ্যাম্পিয়ন ক্যাম্পবেলকে হারালেন। তারপর হারালেন জিমি ঈসেনকে। ঈসেন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চ্যাম্পি-য়ন ছিল। ইংরেজ হলেই যে স্পোর্টস্‌ম্যান হয় না তার উদাহরণ গোবরবাবু একা-ধিকবার পেয়েছেন। ঈসেন লড়তে না পেরে গোবরবাবুকে ঘুষি মেরেছিল, অবশেষে হারতেও তাকে হয়েছিল। ঈসেনকে পরাজিত ক'রে গোবরবাবু টিকিট বিক্রির টাকার অংশ ছাড়া, মিস্টর ফ্লেমিং ব'লে এক ভদ্রলোকের উপহার স্বরূপ ১৬০০ পাউণ্ড পেয়েছিলেন।

জিমি ঈসেন

মরিস ডিরিয়াজ সেকালে একজন খুব বড় পালোয়ান ছিল। সে প্যারিসে নোভোসার্ক ব'লে একস্থানে কুস্তির এক বিরাট দঙ্গল করেছিল, গোবরবাবুও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি দেশে ফিরে আসেন ও কিছুকাল এখানে থেকে আমেরিকা যান। সেখানে অনেকদিন ছিলেন ও অনেক কুস্তি তিনি

লড়েছিলেন। এবং যা ভারতীয় আর কোন মল্লের ভাগ্যে ঘটেনি, অত্যন্ত-সম্মানকর খেতাবও একটা তিনি অর্জ্জন করেছিলেন।

আমেরিকায় থাকার সময় গোবরবাবু যে সকল বিখ্যাত বন্দীদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন, তার কথা ভারতীয় কুস্তির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি অল্ স্যাণ্টেলকে হারিয়ে পৃথিবীর লাইট-হেভী চ্যাম্পিয়ন হন। তারপর তিনি যাদের-যাদের সঙ্গে লড়েছেন তারা সকলেই উচ্চতম পর্য্যায়ের লোক। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোন ভারতীয় কুস্তিগীর এত বেশীবার বিদেশীদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর কুস্তি লড়েনি। বড় গামার খ্যাতি বিস্কো আর রোলারকে হারিয়ে, কিন্তু গোবরবাবু বড় গামার চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু এ-পরিশ্রমের কথা আমাদের দেশে জানা নেই বল্লেই হয়। গোবরবাবুর দুর্ভাগ্য যে, তিনি এ-দেশে তাঁর উপযুক্ত খ্যাতি পান নি। আমাদের দুর্ভাগ্য বল্লুম না, কারণ শক্তির আদর করবার আমাদের জ্ঞান এবং উপযুক্ত জাতীয় বয়স হয়নি।

মরিস ডিরিয়াজ ও আহমদ্ বখশ

বড় বিস্কো একাধিকবার গোবরবাবুর কাছে হেরেছেন, গোবরকে হারিয়েছেনও একাধিকবার। বিস্কো দু' দু'বার পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। জো স্টেকার গোবরবাবুর কাছে হেরেছে, হারিয়েওছে গোবরকে। স্টেকার দীর্ঘকাল পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন ছিল। জিম্ লণ্ডস্ গোবরের সঙ্গে সমান সমান লড়েছে, লণ্ডস্ও উত্তরকালে পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মনে হচ্ছে, যেন সনেন্‌বর্গও গোবরের কাছে হেরেছে। সেও উত্তরকালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। টমি ডুরাক, ভালডেক বিস্কো, আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর মল্ল, তারাও গোবরের প্রতিযোগী ছিল। ভারতীয় কুস্তির ইতিহাসে এত-বড় মল্ল কেউ হয়নি। তবে এ-কথা ঠিক যে, গোবরবাবু বিদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার যত চেষ্টা করেছেন, এদেশে তা করেন নি।

আমেরিকায় তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুস্তি, লুই স্ট্র্যাঙ্গলারের সঙ্গে। লোকটি তখন ছিল পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন। স্ট্র্যাঙ্গলার তার আসল নাম নয়, দমবন্ধকারী প্যাঁচের ওস্তাদ ব'লে তার ওই নামটা হয়েছিল।

আমাদের দেশের মত একবারের কুস্তিতে হার-জিত নির্ণয় করবার নিয়ম য়ুরোপ বা আমেরিকায় প্রচলিত নয়। সেখানে তিন-বারের মধ্যে যে দু'বার জয়ী হয় সেই বিজেতা। লুই স্ট্র্যাঙ্গলারের সঙ্গে গোবরের যে কুস্তি হয়, তাতে একবার গোবর ও একবার লুই জয়ী হন। তৃতীয়বারের কুস্তিতে লুই গোবরবাবুকে ঘুষি মারে। তিনি যখন বিচারককে সে-কথা বলতে থামলেন, সেইসময় লুই পেছন থেকে তাঁর পা টেনে ফেলে দেয় এবং তক্তার পাটাতনে মাথা লেগে গোবরবাবু অজ্ঞান হয়ে যান। আসল ফল অমীমাংসিত হলেও, লুইকেই জয়ী করা হয়।

একবার তাঁর বড় গামার সঙ্গে লড়বার ব্যবস্থা হয়েছিল। কাগজ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল, কিন্তু হঠাৎ তিনি ডিপ্‌থিরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন, সে কুস্তি আর হ'ল না।

১৯২৯ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে গোবরবাবুর ও ছোট গামার কুস্তি হয়েছিল। আমার মনে হয়, তখন গোবরবাবুর প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছিল। কুস্তির একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে যে, লড়তে লড়তে আখাড়ার সীমানায় গিয়ে পড়লে, বিচারক কুস্তি ক্ষণিকের জন্য বন্ধ ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বিদের আখাড়ার মাঝখানে এসে লড়তে হুকুম দেবেন। নূতন ক'রে লড়বার সময়ে পূর্বে যে যে-অবস্থায় ছিল সেই অবস্থা থেকে কুস্তি আরম্ভ হবে। গোবরবাবু ও ছোট গামা যখন সীমানার দড়ির ওপর গিয়ে পড়লেন, বিচারক তাঁদের আখাড়ার মাঝে আসতে হুকুম দিলেন। গোবরবাবু প্রতিপক্ষকে ছাড়লেন বটে, কিন্তু প্রতিপক্ষ হুকুম অগ্রাহ্য ক'রে গোবরকে চিৎ ক'রে দিলেন। দর্শকবর্গ গামার জয়-জয়কার ক'রে উঠল এবং বিচারকও ভড়কে গিয়ে তাদের সমর্থন করলেন। এ-ধরণের বিচার একাধিকবার কলকাতায় দেখা গেছে। লড়তে গেলে, চোট খাওয়া অপরিহার্য্য এবং হার-জিতও তাতে আছে। যে চোট খায় বা হারে, তাতে তার মূল্য কোনরকমেই কমে না। কিন্তু বিচারকের দোষে একজনের চেষ্টা বিফল হ'লে আপশোস করবার যথেষ্ট কারণ থেকে যায়।

গোবরবাবু প্রতিযোগিতামূলক কুস্তি থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু নিজের বিদ্যা মুক্তহস্তে দান করেছেন। তাঁর মত অভিজ্ঞ কুস্তিগীর আমাদের দেশে নেই, অন্য দেশেও আছে কিনা সন্দেহ।

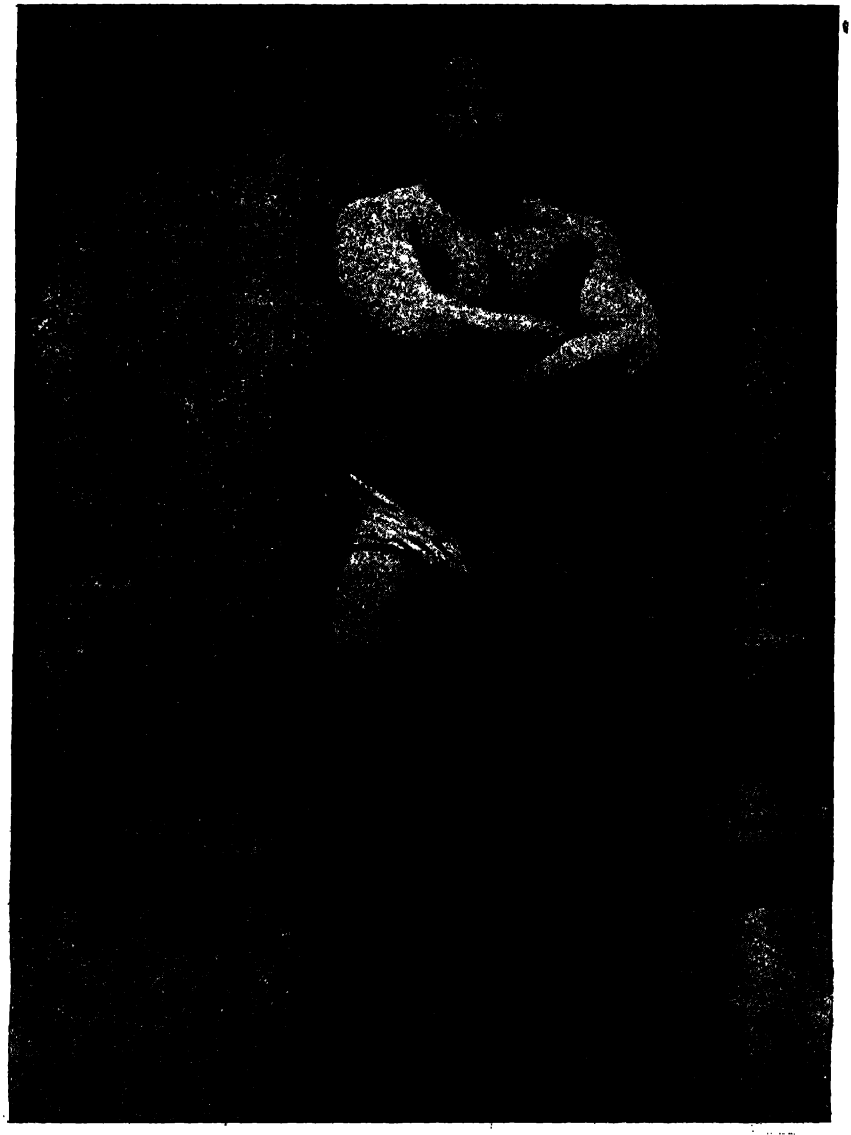

ছোট গামা

আমার এ-কথা বলার কারণ, তিনি যে শুধু ভারতীয় কুস্তির বিশেষজ্ঞ তা নন্, য়ুরোপীয় কুস্তিও তাঁর বিশেষভাবে জানা আছে। নিজে শিখেছেন এ-দেশের বড় বড় ওস্তাদের কাছে। এমন কেউ এ-দেশে নেই যে, তাঁর আখাড়ায় মাটি না মেখেছে। বিদেশে হেকেন্‌স্মিথ,

অহমদ বখ্‌শ্ ও ডিরিয়াজ, কুস্তির সর্ত্ত স্বাক্ষর করছেন

কার্পিলড্ ও তার ম্যানেজার আর্ণেষ্ট ডিলালয়

বড় বিস্কো, ডিক শিক্যাট প্রভৃতি ধুরন্দর লড়িয়েরা তাঁর অভ্যাস-সঙ্গী থেকেছে।

প্রত্যেক বৎসর আমি ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মল্লদের তালিকা প্রকাশ ক'রে থাকি, গোবরবাবু বহুকাল তাতে স্থান পেয়েছেন।

আমাদের জাতীয় অভ্যাস, সাহেবদের মুখ চেয়ে থাকা এবং তাদের খোশামোদ করা। যদি তারা নির্ভর করবার উপযুক্ত হয় তাতে নালিশ করবার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু যখন আমাদের নিজেদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি আছে, তাদের বাদ দিয়ে ঐ কাজটা করা যায়, তখন আমাদের মতি যে সুস্থ এ-কথা বলা যায় না। ভারতে যে অলিম্পিক

সংঘ আছে, তার কর্ত্তারা গোবর বা গামা-ইমামের মত লোকের ধার ধারেন না। অলিম্পিক গেম্‌সে ও অন্যান্য খেলায় ভারতীয় কুস্তিগীর পাঠাবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাদের শিক্ষা দেবার ভার, এবং অলিম্পিক কুস্তির হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা একজন আমেরিকান সাহেব। আর কারো না হোক, আমার এজন্য অত্যন্ত দুঃখ হয়।

গোবরবাবু বিপুল সম্মান অর্জ্জন ক'রে বাঙালী জাতিকে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু বাংলা দেশ তাঁকে কোন সম্মান দেখিয়েছে কি? আজকাল কৃতী খেলোয়াড়দের টাউন হলে অভিনন্দন করবার একটা প্রথা দাঁড়িয়েছে। যাঁরা যাঁরা আজ পর্য্যন্ত এ অভিনন্দন পেয়েছেন, তাঁদের কৃতিত্ব গোবরবাবুর কৃতিত্বের একটি মাত্র কণাও নয়। বাংলা দেশের ক'জন লোক জানে যে, গোবরবাবু পৃথিবীর লাইট-হেভী

বড় বিস্কো

চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, পৃথিবীর চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য লড়েছেন? সকল দেশে যোদ্ধার আদর আছে, কেবল আমাদের দেশে নেই। সাধারণের কাছে সম্মান পেলে যারা, তাদের দেহ সংঘর্ষণ করতে হয়নি, শক্তি ও বিপুল দৈহিক সাহস দেখাতে হয়নি, তারা কেবল খেলার কৌশলের খানিকটা পরিচয় দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি এইসকল পুরুষোচিত গুণের পরিচয় দিয়েছে নানা জাতির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়ে, যে যুদ্ধ একক, দলের সহযোগিতা যাতে নেই, সেইসকল যুদ্ধেও বার বার জয়ী হয়েছে, হেরেছে যখন. তখন প্রতিপক্ষকেও ধূলা-মাটির সমভাগে অংশ নিতে বাধ্য করেছে, সে অবজ্ঞাতই রয়ে গেল আমাদের দেশে। তার কারণ, আমাদের মনে রয়েছে, ক্রিকেট হকি—ভদ্রলোকের খেলা; কুস্তি—বর্ব্বর, দরোয়ানধর্ম্মী ব্যায়াম।

গোবরবাবুকে স্বল্পসংখ্যক নব-খেলাড়ীদের একজন প্রধান ব্যক্তি বলা যায়। নব-খেলাড়ী আমি তাকেই বলি, যে শরীর ও মস্তিষ্ক চর্চ্চার সমন্বয় স্থাপন করেছে। এ আদর্শের অন্য নাম আছে, যথা গ্রীক বা অলিম্পিক আদর্শ। গোবরবাবু শুধু অসাধারণ ব্যায়ামী নন্, সাহিত্য ও সঙ্গীতরসিক ব্যক্তি।

আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখ দিয়ে যদি দেখি, দেখা যাবে যে, কুস্তি ও আনুষঙ্গিক ব্যায়াম শিক্ষা দিয়ে তিনি সমগ্র জাতির চরমতম কল্যাণ করেছেন। এত-বড় কথা আমি গোবরবাবুর ব্যক্তিত্ব বা আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে বলছি না। জাতীয় প্রয়োজন ছাড়া, বৈজ্ঞানিক-তথ্যের দিক দিয়েও দেখলে দেখা যায় যে, একমাত্র আক্রমণক (aggressive) ব্যায়াম ও আক্রমণক খেলা, জাতির ও ব্যক্তির কল্যাণ করতে পারে; যে ব্যায়াম বা খেলা তা করে না,

জাতীয় প্রয়োজনে তার কোনই স্থান নেই। এ-সম্বন্ধে এখন আর আমি কিছু বলব না, ও প্রসঙ্গের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মাত্র, সেটা আলোচনা করবার ক্ষেত্র এটা নয়। এইটুকুই কেবল তোমরা জেনে রাখ যে, আক্রমণক ব্যায়াম শিখিয়ে গোবরবাবু প্রকৃত দেশ-সেবকের কাজ করছেন। তাঁর হাতের তৈরী যুবজনকে দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়।

প্রায় কুড়ি বৎসর আগে আমি রোজ বিকালে হাওড়ার পুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতাম, দেখতাম, দেখবার মত কোন যুবক চোখে পড়ে কিনা; কিন্তু তিনমাসের মধ্যে আমি তেমন যুবক একজনও দেখিনি। আজ বাঙালী-জোয়ান যত্র-তত্র দেখি, আমার দেহে রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ-পরিবর্ত্তনের পেছনে আছেন গোবরবাবু এবং আরো অল্প কয়েকজন অক্লান্ত কর্ম্মী।

নয়

ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা ক্ষুদ্রকায় হলেও, খেলাধূলায় খুব তৎপর, যদিও খুব বেশী গায়ের জোরের পরিচয় তারা দেয় না। ও-দেশের "পাঞ্চো ভিলা" আমেরিকায় বক্সিং ক'রে দৈহিক নিম্ন ওজনের নিরিখে একবার পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আমি যে ফিলিপিনো খেলোয়াড়কে দেখেছি তার নাম অ্যাম্‌ব্রোশিও, যার চেয়ে বড় রোমান রিঙের ওস্তাদ আর এদেশে আসেনি। ভারতের বড়-বড় শহরে অ্যাম্‌ব্রোশিও'র অভিযান হয়েছিল। তার একটা মস্ত গুণ ছিল এই যে, সে নিজের বিদ্যা অকপটে অপরকে দান করত। বিখ্যাত রোমান রিঙ-খেলোয়াড় ৺অপূর্ব্ব দাস ওই ফিলিপিনোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল ও তার কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেছিল।

অ্যাম্‌ব্রোশিও অন্যান্য জিমনাষ্টের মত অত্যন্ত হাল্কা ওজনের ছিল; তাই শরীরটাকে নিয়ে যা-তা করতে পারত। তার ব্যায়াম অন্য অনেক রোমান রিঙের ওস্তাদ হয়ত করতে পারে, কিন্তু তার মত সহজে ও সুন্দরভাবে সব করতে আর কাউকে দেখিনি! এইখানেই ছিল অ্যাম্‌ব্রোশিও'র বাহাদুরী।

'ক্রুসিফিক্স' করতে অ্যাম্‌ব্রোশিও'র নিজস্ব ধরণ ছিল। তার স্ত্রী একটা ট্র্যাপীজে পা আট্‌কে, নিজের দেহ ঝুলিয়ে রিঙ দুটো ঝুলিয়ে দিত; অ্যাম্‌ব্রোশিও তাইতে অন্যান্য ব্যায়াম ক'রে অবশেষে ক্রুসিফিক্স করত। অপূর্ব্ব'র কাছে শুনেছিলাম যে,

সিঙ্গাপুর অথবা মালয় দেশের কোন শহরে খেলা দেখাবার সময় মেয়েটির ট্র্যাপীজ থেকে পা স'রে যায় ও নীচে প'ড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়।

কাশী মিরজাপুর প্রভৃতি শহরে সনাতন ধরণে ভার-তোলার প্রথা আছে এ-কথা আগে থেকেই জানতাম। পূর্ব্বেই বলেছি, এ-ধরণের ভার-তোলায় বারবেল ব্যবহার না হয়ে, পাথরের তৈরী নাল ব্যবহার হয়। এই নাল-তোলার তখনকার শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ দেবী চৌধুরীর কথা আমি ১৯১৬ সালে 'মডার্ণ রিভিয়ু' ও 'প্রবাসী'তে লিখি। সেই থেকে আমার দেবীর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কাশী যাবার সুযোগ হ'ল দীর্ঘকাল পরে। গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, দেবীর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তার ছেলে আছে, এবং সে দেখবারও উপযুক্ত। একদিন প্রয়াগঘাটে তার আখাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন দেবীর পুত্র সহদেও অনুপস্থিত। পাথরের নালগুলির আকার দেখে মনে বিশ্বাস এলো না যে, কোন রক্তমাংস দিয়ে তৈরী মানুষ তা তুলতে পারে। দেবী চৌধুরী এক বিখ্যাত ইংরেজ লেখককে ১২০০ পাউণ্ড তুলে দেখিয়েছিল। সেই সিন্দূরের স্বস্তিক মার্কা-মারা বিখ্যাত ক্ষুদ্র সংস্করণের বিন্ধ্যগিরিটিও দেখলাম মাত্র ও শুনলাম যে, বাপের উপযুক্ত পুত্র সহদেও-ও সেটিকে আয়ত্তের মধ্যে এনেছে। প্রথম দিন পাথরগুলির গায়ে হাত বুলিয়ে বাড়ী ফিরলাম। পরদিন একা এক ক্যামেরা বগলে ক'রে ও পকেটে কিছু টাকা নিয়ে আবার সহদেও-এর আখাড়ায় হাজির হলাম। ঢুকেই দেখলাম এক বিরাটকায় পুরুষ চৌকির ওপর ব'সে আছে। যেমন

কালো তার গায়ের রং, তেমনি তার দেহের বিশালতা! তার দেহ আমি ইচ্ছা করেই মাপিনি। এখন স্বীকার করা যেতে পারে যে, সহদেও-কে আমার ছোঁবার ইচ্ছা ছিল না, তার কারণ তার পেশা ছিল, মনি-কর্ণিকা ঘাটে মড়া-পোড়ানো, আমি তার খোঁজ করতে গিয়ে এ কথাটা আগেই শুনে-ছিলাম। কাজেই এই কথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, অনেক নামজাদা পহলবানেরও সহদেও-এর মত কিরাট দেহ নেই। সহদেও অঙ্গভঙ্গী ক'রে আমার সঙ্গে কথা কইছিল আর তার মসৃণ ত্বকের নীচে পেশীগুলো মাগুর-মাছের ঝাঁকের মত কিলবিল ক'রে উঠছিল।

দেবী চৌধুরী

সে সময়টা অবশ্য ব্যায়াম করবার উপযুক্ত ছিল না, কাজেই ভোর চারটের সময় সহদেও আমাকে তার ব্যায়াম দেখতে যেতে বল্লে, যা তখন সম্ভব হলো না। কথায় কথায় সহদেও বল্লে যে, দেশের অনেক বড় বড় শিবমন্দিরে তার স্বস্তিক মার্কা-মারা নাল আছে তার

দেশ-জোড়া চ্যালেঞ্জের চিহ্নস্বরূপ। বিন্ধ্যাচলে যে বাৎসরিক মেলা হয়, সেখানেও সহদেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নাল তুল্‌ত। তা না হ'লে কাশীতে বড় বড় রাজা মহারাজা বা সাহেবসুবার আহ্বান ছাড়া প্রকাশ্যে সে সাধারণতঃ কিছু করত না।

ছবি তুলতে এবং তার জন্য টাকা দিতে চাইলাম, কিন্তু অল্প টাকায়ও সে রাজী হ'ল না। কাজেই অন্য চেষ্টা করেও আজপর্য্যন্ত আমি তার ছবি জোগাড় করতে পারিনি। সহদেও-এর ব্যায়াম দেখিনি ব'লে আমার দুঃখ নেই, কারণ তার শক্তির যা নমুনা আমি দেখেছি, তা দিয়ে তার সব কথা আমি অকপটে বিশ্বাস করি।

বাঙ্‌লা দেশের কোন জমিদার খুশি হয়ে সহদেওকে একটা ক্ষুদ্র লোহার তৈরী নৌকা দান ক'রে গেছেন। তাতে একজন মানুষ বসতে পারে। নৌকাটার ওজন আন্দাজ আড়াই মণ হবে। সেই নৌকাটা বগলে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে সহদেও প্রয়াগঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে জলের কিনারায় গেল। সিঁড়ি অনেক এবং অত্যন্ত ঢালু।

মড়া-পোড়ানো পেশা ছাড়া সহদেও হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাঁতার শেখাতো ব'লে শুনেছি। শক্তির খেলার বিশেষ সমঝদার এবং লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত হকি-খেলোয়াড়, বন্ধু সুচারু দে আমাকে একবার বলেছিলেন যে, সহদেও দাঁড়া-সাঁতার কাট্‌তো, কোমর পর্য্যন্ত জলের ওপরে রেখে। পায়ের কত শক্তি থাকলে যে জলে বিপুল বাধা সৃষ্টি ক'রে এ-কাজ করা যায় তা বোঝানো শক্ত কথা

সহদেও কোন লোককে ছুরি মেরে দীর্ঘকাল দণ্ড ভোগ করেছিল। তারপর তার মৃত্যু হয়, সে আজ কয়েক বৎসরের কথা।

এ-কথা বলা অন্যায় হবে না যে, সহদেওকে দেখে আমি হয়ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান পুরুষকে দেখেছি।

এবার যার কথা বলব সে-ও সহদেও-রই মত অসাধারণ বলী। ভাগবত রায়ের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তার কীর্ত্তি আমার চোখে অন্য অনেকের কীর্ত্তি ম্লান ক'রে দিয়েছে।

আমি তখন আমার সুবিখ্যাত প্রথম ব্যায়ামপত্রিকা "অ্যাথ্‌লেটিক ইণ্ডিয়া" নিয়ে মশ্‌গুল, আমার ছাত্র প্রফুল্ল এসে খবর দিলে যে, রেওয়ার রাজার হাতায় এক বলী এসে তাঁবু ফেলেছে, কিন্তু তাকে দেখতে বড় একটা কেউ যায় না। আমি ও প্রফুল্ল সেই রাত্রেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভাগবত রায়ের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আলাপ হ'ল। বলিষ্ঠ, অল্পভাষী এবং অত্যন্ত সরল ছোকরা, কিন্তু অত্যন্ত লাজুক। অঙ্গে ইংরেজী সান্ধ্যবেশ, কিন্তু ভিতরের প্লেটেড কামিজটি ভীষণ ময়লা। প্রথম দর্শনে ভাবলাম, গায়ে ওর যতই জোর থাক, যেসব গুণ থাকলে লোক আকৃষ্ট হয় তা ওর মোটেই নেই। সে কিন্তু আমাদের পেয়ে অত্যন্ত খুশী হ'ল। ওর সার্কাস যখন আরম্ভ হ'ল, তখন আমরা ছাড়া মাত্র তিনজন দর্শক অত-বড় বিরাট তাঁবুতে ছিল।

দু'জন মালাবারী, ঢালু তারের ও হরাইজণ্ট্‌ল্ বারের চমৎকার

খেলা দেখালে। তারপর ভাগবত হাতে লোহার পাত জড়ালে, সেটা আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনলাম না। খানিক পরে সে বুকে হাতী রাখলে, হাতী রাখার কায়দা দেখে আমি যে অবাক হলাম সে-কথা বলাই বাহুল্য। তার পরদিন যাবার জন্য ভাগবত আমাদের নিমন্ত্রণ করলে।

পরদিন আমি, প্রফুল্ল, আমার সুবিখ্যাত ছাত্র রবার্ট ইঙ্গ্‌লস্ ও অন্য একটি সাহেব ছাত্র ভাগবত রায়ের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম। সেদিন সে আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। প্রথমে কুস্তির একটা ছোটখাটো দঙ্গল হ'ল। অন্যান্য খেলার পর ভাগবত আমার পাশ থেকে ব'লে উঠে গেল যে, আজ আপনাকে খুশী ক'রে দেব। একটা শোভ্রোলে মোটর-গাড়ী টানার পর ভাগবত মাটিতে শুয়ে পড়ল। বুকের ওপর মস্ত একটা লেপ ভাঁজ ক'রে রেখে তার লোকেরা একটা মোটা বড় চৌকো তক্তা চাপালে, সেটার দু'ধারে মোটা কাঠের খুঁটিও লাগালে। তারপর একটা মাঝারি আকারের হাতী এনে সেই তক্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে খুঁটি সরিয়ে নিলে। সেখান থেকেই ভাগবত আমাকে বল্লে—"হুকুম দিন, কতক্ষণ হাতী রাখব, আধঘণ্টা? একঘণ্টা?" পূর্ব্বদিনও সে এই কাণ্ড করেছিলো। তারপর সেই গুরুভার বুকে নিয়ে ভাগবত লেকচার আরম্ভ ক'রে দিলে, তার মর্ম্ম এই ছিল যে, তার পূর্ব্বতনেরা যে প্রাণায়ামের দোহাই দিয়ে হাতী রাখতেন, সেটা নিছক বাজে কথা। রামমূর্ত্তির কায়দার সঙ্গে নিজের কায়দার তুলনাও করলে। এই বাক্যব্যয় করতে যথেষ্ট সময় লাগল। ভাগবত পাশে এসে

যখন বসল, তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, কপালে একবিন্দু স্বেদও কোথাও নেই।

তারপর এলো বিরাট একটা পাথর, ওজন শুনলাম, আশী মণ। আবার ভাগবত রায় লেপ বুকে নিয়ে শুয়ে পড়ল এবং পাথরটা তার বুকের ওপর চাপানো হলো। আমার দিকে চেয়ে বল্লে, এতে আপনার মন উঠবে না। নিজের লোকদের হুকুম দিলে, তাঁবুতে যা-কিছু ভারী পাওয়া যায়, পাথরের ওপর চাপিয়ে দিতে। বলা বাহুল্য, অবিলম্বে তার বুকের ওপর একটা পর্ব্বত তৈরী হয়ে উঠল। আবার সেই লেক্‌চার, তার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল যে, ব্যাপারটা প্রাণায়ামের ধাঁধা নয়, নিছক গায়ের জোর আর সহনশক্তির ফল।

ভাগবত রায় চতুর হ'লে এবং যাকে বলে, Stagecraft, তা তার জানা থাকলে, ওই বিরাট শক্তির সুবিধা নিয়ে অনেক আকর্ষণকারী বাজে ব্যাপারের দ্বারা লোক আকর্ষণ করতে পারত, এবং এলাহাবাদ থেকে সর্ব্বস্ব বিক্রি না ক'রে কিছু অর্থ সঞ্চয় ক'রে বাড়ী ফিরতে পারত। অনেক যা-তা লোকের ভারত-জোড়া খ্যাতি আছে, কিন্তু ভাগবত রায়কে অতি অল্পসংখ্যক লোকই জেনেছে।

একদিন ভাগবত রায়ের বাসায় গেলাম, দেখলাম সে একটা বার-বেল এবং লীডরম্যানের খানকয়েক বই কিনেছে। ভার তোলা শেখবার ইচ্ছা তার প্রবল ছিল, আমার বাড়ী এসে কিছু শিখে যাবার ইচ্ছাও সে জানালে, কিন্তু তার কোন আশাই পূর্ণ হ'ল না। তার এক ক্ষত্রী ম্যানেজার জুটেছিল। এক ত' রোজগার ছিল অল্প, তার ওপর ছিল

ম্যানেজারের দয়া। এই সরলপ্রাণ বন্দী একদিন তার হাতী, তাঁবু ইত্যাদি সব বিক্রি ক'রে দিয়ে চলে গেল।

ভাগবত কুস্তি ও ডন-বৈঠক ছাড়া অন্য কোন ব্যায়াম করেনি। যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তার বয়স বাইশ বৎসর। বুকের সাধারণ মাপ ৪৭½ ইঞ্চি, বাহুর মাপ ১৬½ ও উরুর মাপ ২৭ ইঞ্চি ছিল। সে আমাকে নিজের ছবি দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল, কিন্তু গোলমালে দিয়ে যেতে পারেনি। তার এক খুড়তুতো ভাই এখানে কলেজে পড়ত, তাকে একবার বলেছিলাম, ছবির কথা ভাগবতকে স্মরণ করিয়ে দিতে। গ্রীষ্মাবকাশের পর সে দেশ থেকে ফিরে এসে বল্লে যে, এক টুকরো জমির সীমানা নিয়ে ভাগবতের এক প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের লোকদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। ভাগবতের এক চপেটাঘাতে তাদের একটি লোকের মৃত্যু ঘটেছিল এবং ভাগবত দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ভাগবত নিজেও জমিদার ছিল। সেই থেকে আমি আর ভাগবতের কোন সংবাদ পাইনি।

একদিকে যেমন রামমূর্ত্তি, সহদেও আর ভাগবত রায়ের মত প্রকৃত বলী দেখেছি, তেমনি মেকী বলীও দেখেছি অনেক। তার মধ্যে সবচেয়ে যে মেকী সে বাঙালী, তার নাম ছিল—জীবন পাঠক। অথচ এককালে কলকাতায় পাঠকের কিছু নাম ছিল।

সে-কালে স্যনবীম ভ্যারাইটি কোম্পানী নামে এক নাচ গান, গণপতির ম্যাজিকের মত ম্যাজিক এবং শক্তির খেলা প্রভৃতির একটা জগা-খিচুড়ির দল এ-অঞ্চলে এসেছিল। বোধ হয় এলাহাবাদ প্রদর্শনী

ভেঙে যাবার পর সেই দলটি লক্ষ্ণৌএ এলো। বলা বাহুল্য যে, জীবন পাঠকের নাম শুনে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

পাঠক প্রচার করলে যে, সে রামমূর্ত্তির মত নাগপাশ দেখাবে। ডাক পেয়ে আমরা তার বুকে শেকল বাঁধতে গেলাম। একটু জোরে বাঁধতেই এই বন্দীটি বল্লে, 'করছ কি? আমার expansion (বুকের প্রসার) যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে!' আমরা তাকে ছেড়ে চলে এলাম।

———

দশ

পঞ্জাবের প্রতি আমার আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকে। মল্ল দেখা তার প্রধানতম কারণ না হলেও, একটা কারণ বটে। ১৯৩১ সালে আমার পঞ্জাবে প্রবাসী হবার প্রয়োজন হ'ল, আমি সুবিখ্যাত ব্যায়াম পত্রিকা "অ্যাথলেটিক ঈষ্টের" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলাম। এক মধুর প্রভাতে বিয়স নদীর বুকের উপর রেলের কামরা থেকে আমি পঞ্জাবের ঐতিহাসিক ভূমির সঙ্গে পরিচিত হলাম। সে-মুহূর্ত্তে পঞ্জাবের অনেক কাহিনী আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

আমার বাস নির্দ্দিষ্ট হ'ল, শিয়ালকোটের প্রান্তবর্ত্তী এক নির্জ্জন বাংলোতে। প্রথম দিনকয়েক বিখ্যাত খেলার সরঞ্জাম নির্ম্মাতা "য়ুবেরয় লিমিটেড'এর কারখানার বিভিন্ন বিভাগে নানা রকম জিনিস তৈরী হতে দেখলাম। সত্যই সে এক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। তারপর আমি নিজের কাজে মন দিলাম। এই 'য়ুবেরয় লিমিটেড'ই প্রথমে 'অ্যাথলেটিক ঈষ্টের' স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

খানিকটা কাজ গুছিয়ে নিয়ে স্থির করলাম যে, পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই গামার বিবরণ থাকা দরকার। কাজেই একদিন গামার সঙ্গে দেখা করবার জন্য লাহোর যাত্রা করলাম, সাথী হলেন শিয়াল-কোটের বিখ্যাত পহলবান, বৃদ্ধ করীম বখ্‌শ্‌। ছ'ঘণ্টা মোটর গাড়ীতে ব'সে আমি করীমের কাছে তাঁর যুগের দুর্দ্ধর্ষ বলীদের গল্প

শুনলাম। লাহোরে গিয়ে কিন্তু কোন কাজ হ'ল না। কারণ, গামা তখন পাতিয়ালায়, আমি খবর না পাঠিয়ে গিয়ে অন্যায় ক'রে ছিলাম। শুধু একটা ক্যামেরা কিনে ও গামার মোরিগেটের ভুবনবিখ্যাত আখাড়ার ছবি তুলে, করীমের গল্প শুনতে শুনতে বাড়ী ফিরলাম।

করীমের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হ'ল তখন তাঁর বয়স ৬৯ বৎসর। ও বয়সের কোন বৃদ্ধকে সুপুরুষ বলা যায় কিনা জানিনে, কিন্তু আমি করীমকে সুপুরুষ বলব। যেমন সুগৌর তাঁর গায়ের রঙ, তেমনি তাঁর শ্রী। বয়স হিসাবেও তাঁকে বৃদ্ধ বলা ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু দেহের শক্তি, গতি আর স্থিতিস্থাপকতা যদি যৌবনের চিহ্ন হয়, তাহ'লে বলব, করীমের এই সকল দৈহিক গুণ তখনো অব্যাহত ছিল। আমার ওখানে যাবার পূর্ব্ব বৎসর গুঙ্গার সঙ্গে করীমের কুস্তি হয়েছিল। গুঙ্গার বয়স তখন সবে ৩৩ পার হয়েছে। লড়বার পূর্ব্বে করীম দর্শকদের চীৎকার ক'রে জানিয়ে-ছিলেন—"গুঙ্গা হাজার জোয়ান ও দুর্দ্ধর্ষ মল্ল হোক, আমাকে বশ করতে পারবে না।" বাস্তবিকই গুঙ্গা আধঘণ্টাতেও এই বৃদ্ধকে আয়ত্ত করতে পারেনি।

তার কারণ, করীম পরলোকগত গুলামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হোন, একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন এবং তিনি ও রহীম দু'জনে মিলে তাঁর বিদ্যার শ্রেষ্ঠতম অংশ আয়ত্ত করেছিলেন। যুবা বয়সে অতিশয় ক্ষিপ্রগতি ও নানাবিধ দাঁও প্যাঁচের জন্য করীমকে কেউ আয়ত্ত করতে পারত না, তবুও তিনি কয়েকবার পরাজিত হয়েছেন, অর্থাৎ তখনকার কালে আরো শ্রেষ্ঠতম মল্ল ছিল। করীম বক্স পেহলড়েওয়ালা একবার

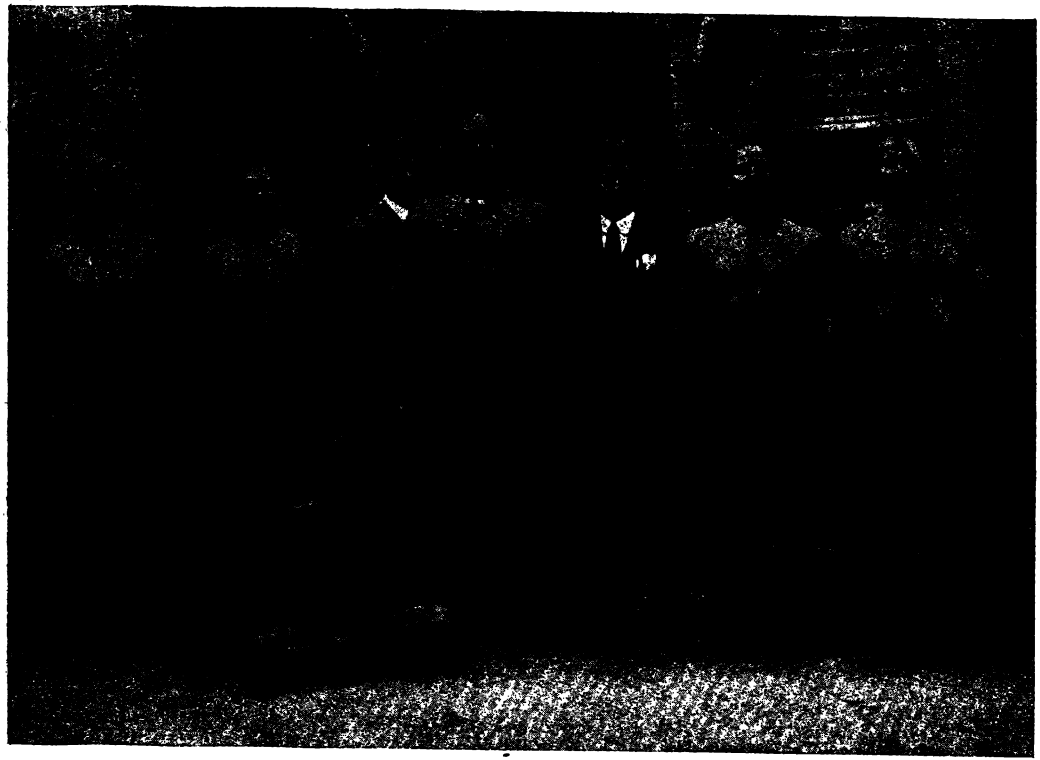

দ্বিতীয় ব্যক্তি গুঙ্গার ছোট ভাই, গ্রন্থকার, ওঙ্গা পহলবান, চুন্নীর পুত্র, সদ্‌রা।

করীমের হাত ভেঙে দিয়েছিল। আজও তাঁর ডান হাতের কব্জিটা ডেলা পাকিয়ে আছে।

আর একজন বৃদ্ধ ওস্তাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল—তিনি সুবিখ্যাত চুন্নী পহলবান। ছোট্ট মানুষটি, তাঁর দেহে তখন মল্লের কোন চিহ্নই ছিল না, তবুও ওখানকার লোক ওস্তাদ ব'লে শ্রদ্ধা করে, তাঁর কাছে মল্লের বিদ্যা শিখতে আসে। চুন্নী বিনয়ী হলেও অত্যন্ত মেজাজী লোক। একদিন ডেকে পাঠালাম, আমার কর্ত্তা বল্লেন—গাড়ী না পাঠালে চুন্নী আসবে না। কাজেও তাই হ'ল। মোটর পাঠাবার পর চুন্নীর আগমন হ'ল। কিন্তু এসে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ! আমি তাঁকে দিয়ে পূর্ব্বকালের পহলবানদের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখালাম। চুন্নীর কাছে সত্যই আমি অত্যন্ত সাহায্য পেয়েছি, শিখেছিও অনেক। যখন যা হুকুম করেছি তিনি তা পালন করেছেন, তবে মাঝে-মাঝে মেজাজের যে নমুনা পাইনি তা নয়। অনেকবার এমন হয়েছে যে, চুন্নী পহলবানী অভ্যাসানুযায়ী দিবাকালে নিদ্রাগত, আমি তাঁর শিয়রে চার-পাঁচ ঘণ্টা চেয়ারে ব'সে ছারপোকার কামড় সহ্য করেছি, কিন্তু তারপর ভূতের পরিশ্রমও করিয়ে নিয়েছি। ছোট ছেলে যেমন আবিষ্ট হয়ে ঠাকুমা দিদিমার কাছে গল্প শোনে, আমিও তেমনি চুন্নীলাল ও করীমের কাছে স্বপ্নাবিষ্টের মত পুরাকালের গল্প শুনতাম।

এঁরা দু'জনেই যৌবনকালে লাখ লাখ টাকা উপার্জ্জন করেছেন, আর দু'জনেই তখন ফকীর, কিন্তু লাখপতির মেজাজটি নষ্ট হয়নি। চুন্নীলালের তখন খদ্দর একমাত্র আশ্রয়, বাড়ীতেও পূর্ব্বকালের বিত্তের

কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু করীম বক্সের অঙ্গে সিল্ক ভিন্ন সূতিকাপড় ওঠে না। চুন্নী একদিন আমাকে বল্লেন যে, করীমের কাছে গোলামের নিজের হাতে নাম সই-করা ছবি আছে। সেই ছবি আদায় করতে গিয়ে আশ্চর্য্য হলাম। ওর বৈঠকখানা যে-কোন উঁচু দরের ড্রয়িং রুমের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ঘরটায় পার্শিয়ান কার্পেট, কালীন, চিপেনডেল চেয়ার, ওভারম্যাণ্ট্‌ল, মসলিনের পরদা ইত্যাদির গাদা। সেগুলি সাজানোতেও রুচির অভাব নেই। করীমের কথাবার্ত্তার ত' তুলনাই ছিল না, অনেক অতি-শিক্ষিত লোকও অমন চমৎকারভাবে কথা কইতে পারেন না। যারা পহলবানদের চাষা ব'লে জানে, করীম কিংবা গামার সঙ্গে আলাপ করলে তাদের ভুল ভেঙে যায়।

বেলা এগারোটার সময় করীমের অনুরোধে চা খেতে হ'ল। চায়ের বাসন দেখে যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলাম, চা খেয়ে তেমনি জব্দ হলাম। তাতে যেমন সরের বাহুল্য, তেমনি গরম মসলার গন্ধ। আতিথেয়তার ত' অপমান করা যায় না, কোন রকমে সেই পঞ্জাবী পহলবানী চা পান ক'রে ছবিটি নিয়ে উঠলাম। কিন্তু ছবি নেওয়াই হ'ল আমার কাল। করীম বল্লেন, আরো ছবি দেব যদি আমার ছেলে সরদার আলির চাকরি ক'রে আর ওকে বিখ্যাত ক'রে দেন। সরদারের বয়স তখন বছর কুড়ি, কুস্তিগীর হলেও, খ্যাতি পাবার উপযুক্ত নয়। আমি সে-সময়টা কোনরকমে তাঁর অনুরোধ এড়িয়ে গেলাম।

এ-বিষয়ে চুন্নীলালও বেশ চালাক। আমি তাঁর কাছ থেকে—পহলবানেরা যে শরবৎ খায় তার মাল-মসলা ও মাত্রার বিষয় জানতে

চাইলাম। চুন্নী বল্লেন, বলতে পারি, যদি ছেলের একটি চাকরি করিয়ে দেন। সে ছোকরা ম্যাট্রিকুলেশান পাশ, তাছাড়া আমার অনুগত ছিল, কথা দিলাম, চাকরি দেবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে সেই ছোকরা আমাকে অনেক স্থানে নিয়ে গেল, কারণ সে চুন্নীর ছেলে, পহলবান-সমাজে তার আনাগোনা ও জানাশুনা ছিল। অবশেষে একদিন তার চাকরি স্থির ক'রে নিয়োগপত্রটা নিজের কাছে রেখে চুন্নীকে ডেকে পাঠালাম। তিনি এলে দেখালাম ও বল্লাম, এইবার দাও আমার জিনিস। বলা বাহুল্য, শরবতের খবর তখনই পাওয়া গেল ; আমি কিন্তু নিয়োগপত্রটি হাতছাড়া করলাম না, কারণ, পহলবানদের যে বিশেষ একটা-ধাপ্পা দেবার অভ্যাস আছে তা আমার জানা ছিল। আমি অন্য বিশিষ্ট মল্লদের কাছে চুন্নীর তালিকাটা ভালো ক'রে যাচাই ক'রে নিয়োগপত্রটি দিলাম।

হৃৎপিণ্ড মজবুত রাখবার জন্য পহলবানেরা লড়বার আগে 'বংশ-লোচন' খায়। চুন্নীর কাছে ও-পদার্থটি দেখেছি, তার গুণাগুণও জানা আছে, কিন্তু তার ব্যবহার জানলাম বহুকাল পরে, বন্ধু গোবর-বাবুর কাছে। পঞ্জাবীরা বলতে চায় না কিছু। জিজ্ঞাসা করলেই বলে—আপনাকে বলামাত্র ত' সেটা দুনিয়াময় প্রকাশ ক'রে দেবেন। কথাটা অবশ্য অতিশয় সত্য। যে শরবৎটার কথা বল্লাম, সেটার তথ্য আবিষ্কার করতে আমার পঁচিশ বছর লেগেছে। বরাবরই ওরা বল্‌ত, —কি করবেন জেনে, ও শরবৎ খেতে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা খরচ। অথচ গোটা-দুই টাকার মসলা একজন সাধারণ ব্যায়ামীর পক্ষে যথেষ্ট।

ডিসেম্বর মাসে আমি লাহোর গেলাম। তখন "সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটরী গেজেট" প্রেসে আমার পত্রিকা ছাপা হ'ত। দপ্তরীখানার একজন আমাকে একদিন বল্লে—'আমার ভাই বড় পহলবান, রোজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে, কিন্তু দেখা হয় না।' দেখলাম, সেদিনও ফটকে ব'সে একটি লোক আমার অপেক্ষা করছে। তার নাম সিরাজুদ্দীন, পঞ্জাবে তার বেশ নাম থাকলেও, বাইরে বিশেষ পরিচিত নয়। দু'একটা কথার পরেই বল্লে—'হুজুর, গামার ছবি ছাপছেন কেন? পঞ্জাবে ত' ওর চেয়ে বড় মল্ল রয়েছে!' আমি বল্লাম—'সে বড় মল্ল, তুমি না কি?' লোকটা অপ্রস্তুত হ'ল। আর সে-কথার উল্লেখ না ক'রে বল্লে যে, তার এক শিষ্য আছে, আমি যদি দয়া ক'রে তাকে একবার দেখি। এ-কথাও বল্লে যে, তার সে শিষ্য আগে গামার চেলা ছিল, তখন ওর কাছে লড়ে। সিরাজ যা-তা মল্ল নয়, বিস্কো যখন এ-দেশে এসেছিল, সিরাজ তাকে লড়াতো; কাজেই তাকে আমার গাড়ীতে তুলে নিয়ে খানিক দূরে একটা বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীটি একটি পুলিস ইন্সপেক্টারের।

দূর থেকে দেখলাম, একটা বারান্দায় এক ভীমকায় যুবকের মালিশ চলছে। সিরাজ, গৃহস্বামী ও যুবকটিকে ডেকে এনে আমার পরিচয় দিলে। সেই যুবক আব্দুল রশীদ, দেহ তার যে-কোন বড় পহলবানের মত। বয়স শুনলাম মাত্র আঠারো বছর। খুব খুশী হলাম এ-কথা শুনে যে, সে ইসলামিয়া কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। রশীদের বাপ তাকে আমার হাতে সমর্পণ করলেন। আমি পরে রশীদকে যথোচিত খ্যাতি দেবার চেষ্টা করেছি। তার মত

বলীদের গল্প

আব্দুল রশীদ

বলশালী লোক রোজ চোখে পড়ে না, তবে মাথায় 'ঘি' একটু কম ব'লে মনে হ'ল।

রশীদের বাড়ীর পেছনে ব্যায়ামাগার; একটা বারবেল দেখলাম বটে, কিন্তু সেটার ব্যবহার আছে ব'লে মনে হ'ল না।

সেখানে একটা নিমগাছে প্রায় ৩০ ফুট ওপরে একটা ভারী কপিকলে মোটা কাছি পরানো, তার একপ্রান্তে ১৬০ পাউণ্ড ওজন বাঁধা। সিরাজের কথায় রশীদ পা জোড় ক'রে ও দেহ সম্পূর্ণ সোজা রেখে, ছ'বার সেই বিষম ওজনটা দড়ি টেনে তুল্লে আর নামালে। ১৬০ পাউণ্ড তোলা আমি খুব শক্তির কাজ মনে করি না, অবহেলায় তা তোলা যায়। কিন্তু কূয়া থেকে জল তোলার ধরণে সেটাকে ওপরে তোলা, সে কি বিষম কথা তা বলতে পারি না। অনেক বলীকে দেখেছি, একশো পাউণ্ডও এ-উপায়ে তুলতে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। সিরাজ ওজনটাকে মাটি থেকে হাত-খানেক তুলেছিল, আমি সেটাকে স্থানভ্রষ্টও করতে পারিনি। পরে আমি এটাকে একটা বিশিষ্ট ব্যায়ামের ধারার ভেতর ফেলে আমার নিজের ব্যায়ামাগারে ও কোলকাতায় কোন কোন ব্যায়ামাগারে চালিয়েছি। রশীদের এইটুকু পরিচয় যথেষ্ট।

রশীদ পরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। প্রাইমো কার্ণেরা যখন ভারতে আসতে চেয়েছিল, রশীদ তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ১৯৩২ সালে অলিম্পিক গেমস্-এ রশীদকে পাঠাবার আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। বড় মল্ল হলেও সে-বৎসর মাদ্রাজে নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতাতেও সে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ পায়নি।

এগারো

শিয়ালকোট থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে উগোকী গ্রাম। মানুষের বসতির চেয়ে, গমের ক্ষেতই সেখানে বেশী। গ্রামটায় পাকা বাড়ীর সংখ্যা খুবই অল্প, যা আছে তা ছোট, কেবল একটা বাড়ী দুর্গের মত বিরাট। সেই বাড়ীটায় বিখ্যাত মল্ল গুঙ্গা আর তার বাপ গামু বালীওয়ালার বাস। গোটা-চল্লিশ গরু-মহিষ, দুটো ঘোড়া আর দুটো গাড়ী ওদের বাড়ীর হাতাতেই দেখা যায়। বাড়ী-সংলগ্ন গমের জমিও অনেক। থাকবারই কথা, কারণ গুঙ্গারা পুরুষানুক্রমে ধনী।

গুঙ্গার পিতামহ বালী বিখ্যাত মল্ল ছিলেন। তাঁর বিষয়ে যা শোনা যায় তা গল্পকথা। কিন্তু গুঙ্গার পিতা গামু বালীওয়ালার কিছু গল্পকথা নয়, অনেকেই তাঁর বিরাট কীর্ত্তি চোখে দেখেছে। গামু, গামা ইত্যাদির পূর্ব্বপুরুষের সময়কার মল্লবীর; সুবিখ্যাত রহীম, গামার গুরু মাধো সিং প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী ও সমকক্ষ। তাঁর সময়ে গুলাম ছিলেন বড় ওস্তাদ। গামুর চার ছেলেই পহলবান, বড় ছেলে গুঙ্গাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মল্লদের তালিকায় ফেলা যায়, মেজ সদরউদ্দীন বা সদ্‌রাও, বড় মল্লদের তালিকার অন্তর্গত; কিন্তু তাকে আমি প্রথম শ্রেণীর মল্ল ব'লে মনে করি না।

গুঙ্গাকে দেখতে যাবার ঠিক করলাম যেদিন, সেদিন প্রচণ্ড শীত। আটাশ ডিগ্রি যে কি, তা বাংলাদেশের পাঠকদের বোঝান শক্ত। অনেক গরম কাপড় প'রে থাকা সত্ত্বেও আমার বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরেছিল, কিন্তু আমার গাইড অর্থাৎ চুন্নীর ছেলে একটা

পাত্‌লা সার্জ্জের সূট্ পরেও দিব্য আরামে ছিল। শীত, বাদলঘেরা আকাশ আর উদ্দাম ঝোড়ো-হাওয়া আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল।

দূর থেকে ওদের সদর দরজায় এক নগ্নকায় সুগঠিত ব্যক্তিকে দেখে মনে করলাম, ওই গুঙ্গা। চুন্নীর ছেলে বল্লে, ও সদ্‌রা, গুঙ্গার চেহারা অত মামুলি নয়। সদ্‌রা আমাদের খুব খাতির ক'রে স্বাগতম্ সম্ভাষণ করলে। সেখান থেকেই ভেতরের প্রাঙ্গণে নজর পড়ল, এক অতিকায় মল্ল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত দোলাচ্ছে। গুঙ্গার চেহারা দেখবার মত বটে। ভেতরে গেলাম। প্রাঙ্গণের পাশের দিকে এক মাদুরের ওপর এক বিশালদেহ বৃদ্ধ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, মেহেদির রঙে-রঙানো লাল তার দাড়ি, মাথার চুল সাদা ছাড়া দেহ দেখে বোঝা শক্ত যে, লোকটি বৃদ্ধ, বাহাত্তর বছর তার বয়স। চুন্নীর ছেলে নিম্নস্বরে বল্লে, এই সেই বিখ্যাত গামূ বালীওয়ালা। দেখি কাকে? বাপ ও ছেলে দু'জনেই সমান দর্শনীয়। গামূর তখন মালিশ চলছিল। ওই বৃদ্ধের বাহু, বুক, উরুর গঠন তখনো এত বিশাল ও সুন্দর যে, অনেক যুবক তা পেলে গর্ব্ব অনুভব করতে পারে। গামূর সঙ্গে পরে আমার আলাপ হ'ল, বুড়ো ভারী স্বল্পভাষী ও গম্ভীর। আমি অনেক অনুরোধ করেও তাঁকে আমাদের ক্যামেরার সামনে আনতে পারলাম না। বুড়োর মুখে সেই এক কথা—আমার দিনকাল শেষ হয়ে গেছে, আমার আর ওসবের দরকার নেই। আমার বাস্তবিকই অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল এই সাধারণ বৃদ্ধটির বিষয়ে সব খবর সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করি। আমি এত নিরাশ হয়েছিলাম যে, এর পরে আর কোন বৃদ্ধ মল্লের বিষয়ে কিছু জানবার আগ্রহ করিনি।

আশ্চর্য্য এই যে, যাদের যাদের সঙ্গে আমার পরে দেখা হয়েছে, তারা আমাকে দেখে ভীত হয়ে মুখ বন্ধ করেছে, সকলেরই ওই এক ভাব, —আমাদের নিয়ে আর টানাটানি কেন ?

গুঙ্গার আসল নাম ফিরোজউদ্দীন, কিন্তু বোবা ব'লে ওই নামটাই চলে গেছে, আসল নামটা খুব বেশী লোক জানে না। গুঙ্গা জন্ম হতে মূক নয়। তিনবৎসর বয়সে তার প্লেগ হয়েছিল, রোগ সারল বটে, কিন্তু ওর জিহ্বাকে জড় ক'রে দিয়ে গেল।

চুন্নীর ছেলে নানা ইশারা ক'রে আমার পরিচয় দিলে, সে দেখলাম গুঙ্গার সঙ্গে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা কইতে খুবই অভ্যস্ত। গুঙ্গা একগাল হেসে আমার দিকে তার বিরাট থাবাটি বাড়িয়ে দিলে। পরে আমিও তার সঙ্গে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা কইতে শিখেছিলাম।

যারা বলে যে, মল্লরা চর্ব্বির পাহাড়, তাদের আমি গুঙ্গাকে দেখতে বলি। তার দেহে মেদের বালাই নেই, পেশীর বিভাজন রেখাগুলিও সুস্পষ্ট। এমনকি, পেটের পেশীতেও সে-রেখার অভাব নেই। আমি গুঙ্গাকে মাপতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। গোল বাধল, কোমর মাপা নিয়ে। গুঙ্গা হাবা কালা হলেও তার এ জ্ঞানটি টনটনে যে, কোমরের মাপটা বেশী হওয়া উচিত নয়। সে পেটটা সঙ্কুচিত করবার চেষ্টা করতে লাগল, আর আমিও তার পেটের পেশী ধ'রে টানাটানি আরম্ভ ক'রে দিলাম, অবশেষে দু'জনে খুব হাসলাম। বুকের মাপের বেলাতেও কোনরকমে তাকে বুক আকুঞ্চিত বা সম্প্রসারিত করাতে পারলাম না, কাজেই সাধারণ মাপই নিলাম। কত যে বিশাল-

মাঝখানে বসে উল্লা (পরবর্তী কালের ছবি)

বিশাল বুক আমি মেপেছি তার ইয়ত্তা নেই, ও কাজটি করতে প্রত্যেকবার আমার নিজের দেহেই রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

গুঙ্গার উরুর উৎকর্ষ অসাধারণ। কিন্তু সব পহলবানের পায়ের গুলের (Calf) যা দোষ থাকে, গুঙ্গারও তা আছে ; অর্থাৎ দেহের অনুপাতে পায়ের 'গুল' খুবই রোগা। আগে কারণটা বুঝতাম না, মল্লরা বলত, ওরা গোড়ালি তুলে বৈঠক দিয়ে দিয়ে ইচ্ছা করেই গুল দুটো রোগা ক'রে রাখে, যাতে গতি আর ক্ষিপ্রতার কোন বাধা না হয়। দিনকতক এ-কথাটা বিশ্বাস করেছিলাম, কাজেই সুঠাম দেহে এত-বড় একটা খুঁত রাখার জন্য ওদের কাছে অনুযোগ করতে ছাড়তাম না। আসলে কিন্তু ও খুঁতটা ব্যায়াম-ধারা সম্বন্ধীয় নয়। ওটা জাতিগত। কালো তামাটে আর কিছু কিছু পীতজাতীয় লোকদের পায়ের পাতা খুব লম্বা হয়, এবং তা হলেই পায়ের গুল ছোট হতে বাধ্য ; এই প্রাকৃতিক খুঁত থাকলেও এসব লোকের শ্বেতজাতিদের তুলনায় চলনভঙ্গি সুন্দর। তবে এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে, যেমন ভারতবর্ষের অনেক পাহাড়ীরা। কিন্তু ব্যতিক্রমটা ব্যাপক নয়। গুঙ্গার হাতের পাঞ্জা দেখবার মত, আঙুলগুলোকে বড় বড় কলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

কুস্তি লড়বার উপযুক্ত এবং টাকাকড়ির বিষয়ে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকলেও বেচারা বড় বোকা। কোন অঙ্ক গোণবার ওর ক্ষমতা নেই, কাজেই ডণ্ড্ বৈঠক দেবার সময় ওকে ওর ভাইদের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রাত্যহিক ওর দু'হাজার ডণ্ড্ দেবার কথা, সে সংখ্যা পুরো হ'লে ভাইয়েরা কেউ ওর গায়ে একটা ছোট ঢিল মারে, কিন্তু

এক-একদিন দুষ্টামি ক'রে ওরা ঢিল মারাটা স্থগিত রাখে, আর গুঙ্গা সে-সময়ে তিন-চার হাজার ডণ্ড্ দিয়ে যায়! কিন্তু বুঝতে যখন পারে, তখন কিছু না ব'লে ও শোধ তোলে, কুস্তি অভ্যাস করবার সময়ে। সদ্‌রা আমাকে বলেছিল যে, ও-রকম কাণ্ড ঘট্‌লে তিন-চার দিন পর্য্যন্ত ওরা আর গুঙ্গার সঙ্গে লড়ে না।

আমাকে দেখাবার জন্যে সদ্‌রা ও গুঙ্গা কুস্তি আরম্ভ করলে। সদ্‌রা দাঁও-প্যাঁচ করে, গুঙ্গা গায়ের জোরে তা কাটায়। একবার গুঙ্গা সদ্‌রার গোড়ালিতে পা দিয়ে আঘাত করলে, সে পাঁচ হাত দূরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল! গামার যেমন হাত দিয়ে আঘাত করা অভ্যাস, গুঙ্গা তেমনি পা ব্যবহার করে।

গুঙ্গা বার বার বড় গোঁফের ইসারা ক'রে উরু চাপড়াতে লাগল, তার অর্থ—আমাকে গামার সঙ্গে লড়িয়ে দাও! জীবনে ওটা ওর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। আমার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে, গুঙ্গা ওই ইসারা করেছে। কিন্তু সে গামার সঙ্গে লড়বে কোথা থেকে! উনিশ বছর বয়সে ও একবার ইমাম বখ্‌শ্‌কে হারিয়েছিল, সেইটিই ইমামের জীবনে একমাত্র পরাজয়, তারপর ওকে ইমাম দু'বার হারিয়েছে, আর দু'বার কুস্তির ফল সমান সমান হয়েছে! আমি ওকে বোঝাতাম যে, ইমামকে হারাতে না পারলে, গামার নিকটবর্ত্তী হবার আশা কম। গুঙ্গা মুখ বিষ ক'রে, কপালে আঙুলের টোকা দিয়ে বোঝাতো যে, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হ'লে সেটি আর সম্ভব হবে না।

গুঙ্গার খান-দুই ছবি নেওয়া হয়েছিল। তার পরদিন থেকে সকাল বিকাল ও ছবির কপির জন্য তাগাদা আরম্ভ করলে, এমন কি, ফটোগ্রাফারও ওর তাগাদা থেকে রেহাই পেলে না। ছবি পেয়ে

গুঙ্গা ও তার বাপের অন্যরকম তাগাদা আরম্ভ হ'ল, সেটাও অবশেষে মেটাতে হ'ল।

আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, গুঙ্গার গায়ে অসাধারণ বল। সেটার আন্দাজ নেবার জন্য আমার ইচ্ছা ছিল ওকে দিয়ে বারবেলের 'ডেড্‌লিফ্‌ট্' করবো, যার চেয়ে বল পরীক্ষা করার ভালো উপায় আর নেই। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গুঙ্গাকে আমার বাংলোতে আনতে পারিনি, গামু বাধা দিতেন। এই বাধা দেবার কারণটা বলি। গুঙ্গার বাড়ীতে একজোড়া লোহার ডাম্বেল ছিল, এক-একটার ওজন আন্দাজ ৩৫ পাউণ্ড। ডাম্বেল তোলার 'crucifix' ব'লে একটা কায়দা আছে, তাতে ডাম্বেল হাতে নিয়ে বাহু দুটো পাশের দিকে কাঁধ থেকে horizontal ক'রে রাখতে হয়। এই অবস্থায় রাখার জন্য বাহু ওপর থেকে নামানো যায়, নীচের থেকেও তোলা যায়। গুঙ্গাকে একটু জ্বালাতন করবার জন্য আমি crucifix করলাম, গুঙ্গাও উৎসাহিত হয়ে তাই করতে গিয়ে বার বার অকৃতকার্য্য হ'ল এবং ওর মুখ শুকিয়ে গেল। গামু পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, বোধকরি ছেলের কীর্ত্তিতে রাগে তার লাল দাড়ি ঘন ঘন নড়তে লাগল। ডাম্বেলেই এই, বারবেলে না-জানি কি হবে। তার ওপর আমি লেখক, হয়ত-বা গুঙ্গার এই ব্যাপারটা ঘোষণা ক'রে বেড়াব! গামু আমার অফিসে ছেলেকে যেতে দিলেও, বাড়ীতে না আসতে দেবার বিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন, যদিও আমার বাড়ীর ধার দিয়েই তাঁদের শিয়ালকোট শহরে যাতায়াত করবার পথ ছিল।

ডাম্বেল নিয়ে আমি শুধু গুঙ্গাকে ঠকাইনি, চুন্নীর আখড়ায় ইনায়ত, সুন্দর সিং প্রভৃতিকেও জব্দ করেছি। এ ছাড়া আর-একটি জিনিস

আমি ওদের ক'রে দেখাতাম, যাতে ওদের হৃদকম্প হ'ত। ক'ড়ে-আঙুলে কিছু ওজন ঝুলিয়ে, কাঁধ থেকে সেই হাত সোজা সামনের দিকে প্রসার ক'রে দেয়ালে আমি উর্দ্দু বা ইংরেজিতে আমার নামের পদবীটি লিখতাম। ওরা তাতে আমাকে দৈত্য ব'লে মনে করত! অবশ্য এ-কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে, ওদের গায়ে শক্তি নেই, বা আমি ওদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী; আমার দেহের পেশী ওই-সব করতে অভ্যস্ত, কিন্তু ওদের নয়—গোপন কথাটা মাত্র এই। গুঙ্গা ত' দূরের কথা, ইনায়েত আমাকে একটি চাপড় মারলে বোধ করি ছ'মাস ঝোল-ভাত খেতে হবে! তবে এইরকম ক'রে ফাঁকি দিয়ে শিয়াল-কোটের মল্ল-সমাজে আমার কিছু প্রভাব হয়েছিল। আমার হাতের আর-একটি অস্ত্র ছিল, আমার লেখা উর্দ্দু চিঠি, সেটাকে করীম বখ্‌শ্ সাংঘাতিক ভয় করত। এমনি ডেকে পাঠালে আয়েসী করীমের দেখা পাওয়া সব-সময় সম্ভব হ'ত না, কিন্তু চিঠি পাঠালে করীমকে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যেত, কেননা উর্দ্দু পড়ার চেয়ে দেখা করা ওর পক্ষে ঢের সহজ হ'ত!

একদিন গুঙ্গা আর হামিদার কুস্তি দেখতে অমৃতসর ছুটলাম। হামিদা 'ফুর্ত্তিলা' পহলবান হলেও, দু'জনের কেবল আধঘণ্টা ঠেলাঠেলি দেখে আমার বিরক্তি ধ'রে গেল। মোটরগাড়ীটা অফিসের বটে, কিন্তু তেলের খরচাটা আমাকে করতে হয়েছিল, সেই বৃথা খরচ আর অকারণ দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য মেজাজ এত খারাপ হ'ল যে, না তুল্লাম মল্লদের কোন ছবি, না দেখলাম অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির, যা পরে আর দেখবার সুযোগ ক'রে উঠতে পারলাম না। অবশ্য ওরকম লোক-ঠকানো কুস্তি যে আর দেখিনি, তা নয়। এই এলাহাবাদেই

সুবিখ্যাত মল্ল হামিদা

একবার বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে বুড়ো কাল্লুর কুস্তি দেখতে গিয়েছিলাম। আধমিনিটের মধ্যে কাল্লুর বিপক্ষটি আপনা হতেই ধুপ ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর আর কি! টিকিট বিক্রির টাকা ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে যে যার বাড়ী গেল। বলা বাহুল্য, মল্লবীরেরা মাঝে মাঝে এইরকম ক'রে বেশ টাকা উপায় ক'রে থাকেন।

শিয়ালকোটে আমার এক শিখ বন্ধু ছিলেন, তাঁর নাম—সর্দ্দার বলবন্ত্ সিং! বলবন্ত্ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। তাঁর মত অমন বিরাট চেহারা সদা-সর্ব্বদা চোখে পড়ে না, কিন্তু শিখদের মধ্যে ওরকম চেহারা বিরল নয়। প্রকৃতি নিজে এইসব মানুষদের অতিকায় ক'রে তৈরী করেছেন। বলবন্ত্ যুবা বয়সে হকি খেলতেন, লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের তিনি হকি ক্যাপ্টেন ছিলেন। হকি খেলা ছাড়া তিনি জীবনে বড় একটা ব্যায়াম করেন নি। আমার তখন নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই দিন কাট্‌ত। একদিন বিকালে বাড়ীতে এসে নিজের প্রাঙ্গণে 'হ্যামার' ফেলা অভ্যাস করছিলাম, এমন সময় বলবন্ত্ এসে হাজির; বল্লেন, কলেজে থাকতে দু-দশবার ফেলেছি, আজ দেখা যাক, এতকাল পরে কতটা ফেলতে পারি। বলবন্তের অঙ্গে ইংরেজি পোষাক ছিল, মাথায় ছিল শিখ-পাগড়ী। কোট বা পাগড়ী না খুলেই বলবন্ত্ হ্যামারটা ঘুরিয়ে অক্লেশে ১৩০ ফিট দূরে ফেলে দিলেন, তাঁর কীর্ত্তিতে আমার চোখ কপালে উঠল! আমি নিজে কখনো ১০০ ফিটের বেশী ফেলিনি, কিন্তু সেটাই আমার আশ্চর্য্য হবার কারণ নয়। সে-সময়ে ভারতের অলিম্পিক রেকর্ড ছিল মাত্র ১১৬ ফিট, এবং সেটা করেছিলেন লাহোরের বেদী ব'লে একজন লোক। বলবন্ত্

অবলীলায় ও প্রথম চেষ্টাতেই ভারতের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেলেন। তাঁর মুখে শুনলাম যে, তাঁদের কালে এক ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন, তিনি ১৬০ ফিট ফেলতে পারতেন, তাঁর কাছেই বলবন্তের শিক্ষা। অবশ্য, পৃথিবীর রেকর্ডের তুলনায় এসব অকিঞ্চিৎকর। ১৯১৩ সালে রোজ ব'লে এক ব্যক্তি হ্যামার ফেলেছিল ১৮৯'৬ ফিট, তারপর বহুকাল কেটে গেছে। পরবর্ত্তী কালের বীরেরা তার কাছেও পৌঁছোতে পারেনি। মাত্র সেদিন ১৯৩৮ সালে একজন আমেরিকান ১৯২ ফিট হ্যামার ফেলেছে।

হ্যামার ফেলা অনেক শক্তির কাজ। দেখতে জিনিসটা মোটেই ভয়ানক নয়। কিন্তু ওটাতে ঘুরপাক দিলে সত্যই ভয়ানক হয়ে ওঠে। বাঙলাদেশে অথবা বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে হ্যামার ফেলার রেওয়াজ নেই। বাঙালীর ছেলে তখন লোহা বাঁকাতে আর পেশীশাসন করতেই ব্যস্ত; শক্তিচর্চ্চা তাদের মনের সীমার বাইরে ছিল। আমার নিজের অবশ্য এটা একটা খুব প্রিয় ব্যায়াম ও ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রতিযোগিতা করতে এখনো আমার ভাল লাগে। বলবন্তও আমার সমবয়সী। ৩৮ বৎসর বয়সে ও রকম কৃতিত্ব সাধারণ কথা নয়, জোয়ান ছেলেরাও তা পারে না।

বারো

নামজাদা মল্লদের দলে, মুসলমান মল্লের সংখ্যাই বেশী, এবং আমার মনে হয়, মুসলমান সম্প্রদায় কুস্তির চর্চ্চা করে, বেশী ক'রে। তার কারণ, মুসলমানদের এখনো পর্য্যন্ত গায়ের জোরের প্রতি ভক্তি ও মনে আক্রমণাত্মক ভাব আছে। আবার পঞ্জাবী মুসলমানেরা এ-বিষয়ে যে খুবই বড়, এ-কথা বিশেষ ক'রে বলবার দরকার নেই।

অনুপাতে কম হলেও, হিন্দু মল্ল এক-একজন খুব বড় হয়ে গেছেন। গুলামের কালে ছিলেন সুচেৎ সিং ও কিক্কড় সিং। কিক্কড় যে গুলামের সম্পূর্ণ সমকক্ষ ছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি। এঁদের ঠিক পরে যে হিন্দু মল্ল খুব বড় হয়েছিলেন, তাঁর নাম—বিদ্দো ব্রাহ্মণ বা বিদ্দো পণ্ডিত। কিক্কড়ের প্রতিপত্তির সময়ে বিদ্দো ছোট পহলবান ছিলেন, ক্রমশঃ তিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মল্ল হয়ে দাঁড়ান। শেষে ১৯১৬ সালে তিনি গামার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে আট মিনিটে হেরে যান। তখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। তারপর তিনি কুস্তি থেকে অবসর নেন।

বিদ্দোর বাড়ী গুজরাঁওয়ালা শহরের উপকণ্ঠে। আমি একদিন বিদ্দোর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মস্ত বাড়ী, মেলাই ক্ষেত-খামার; প্রবাদ এই যে, বিদ্দো পণ্ডিত পনেরো লক্ষ টাকার মালিক। দেখতে বিদ্দো বেশ গোলগাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত, চোখে যোদ্ধার জ্যোতি নেই। বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ে যে, এই মল্লটি শক্তি ও কৌশলের গুণে একদিন ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মল্ল ছিলেন।

আমরা যেতে, বিদ্দো খুব যত্ন ক'রে বসালেন। আলাপ-পরিচয় হবার পর তিনি অনেক জিলাপী ও মস্ত একগ্লাস দুধ এনে হাজির করলেন ; বল্লেন, কিছু না খেলে কোন কথা কইব না। একে তখন বেলা বারোটা, কিছু খাবার সময় নয়, তার ওপর বাজারের কিছু এবং অপরিচিত স্থানে কিছু খাওয়া আমার নিয়মবিরুদ্ধ, আমি মহা মুস্কিলে প'ড়ে গেলাম। শেষে বৃদ্ধ এত ক্ষুণ্ণ হলেন ও অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন যে, একটু দুধ খেতেই হ'ল।

বিদ্দোর তখন কুস্তি সখ আর নেই, বাড়ীতে আখাড়া আছে, দু'চারজন সেখানে লড়ে, এই মাত্র। কালে-ভদ্রে তিনি একটু-আধটু উপদেশ দেন। তখন বিদ্দোর কেবল টাকার পূজা। লোকটির ছেলেপুলে নেই, অত টাকা থাকলেও টাকা বাড়াবার নেশাটি কিন্তু বিলক্ষণ আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, পণ্ডিত, তোমার জমি কতখানি? জবাব পেলাম, যতদূর তোমার দৃষ্টিপথে পড়ে—৩৩টা। গোয়ালেও তাঁর গরু-মহিষের পাল।

কুস্তি লড়ে বিদ্দো অবশ্য সব টাকাটা রোজগার করেন নি। যা-কিছু তিনি রোজগার করেছেন, সেটা সঞ্চয় ক'রে দীর্ঘকাল মহাজনী কারবার করেছেন, তাতেই মূল টাকাটা অপরিমিতভাবে বেড়ে গেছে। করীম, চুন্নী যৌবনকালে বিদ্দোর মত, বা তাঁর চেয়েও বেশী রোজগার করেছেন, কিন্তু এক পয়সাও রাখতে পারেন নি। বিদ্দো পণ্ডিতের মত সকলেরই কিছু টাকা হয় না, তবুও আমার মনে হয়, পহলবান সম্প্রদায় যেমন সংযমী, তেমনি সঞ্চয়ী। কেবল দু'চারজনকে দেখেছি, যারা বাবু-

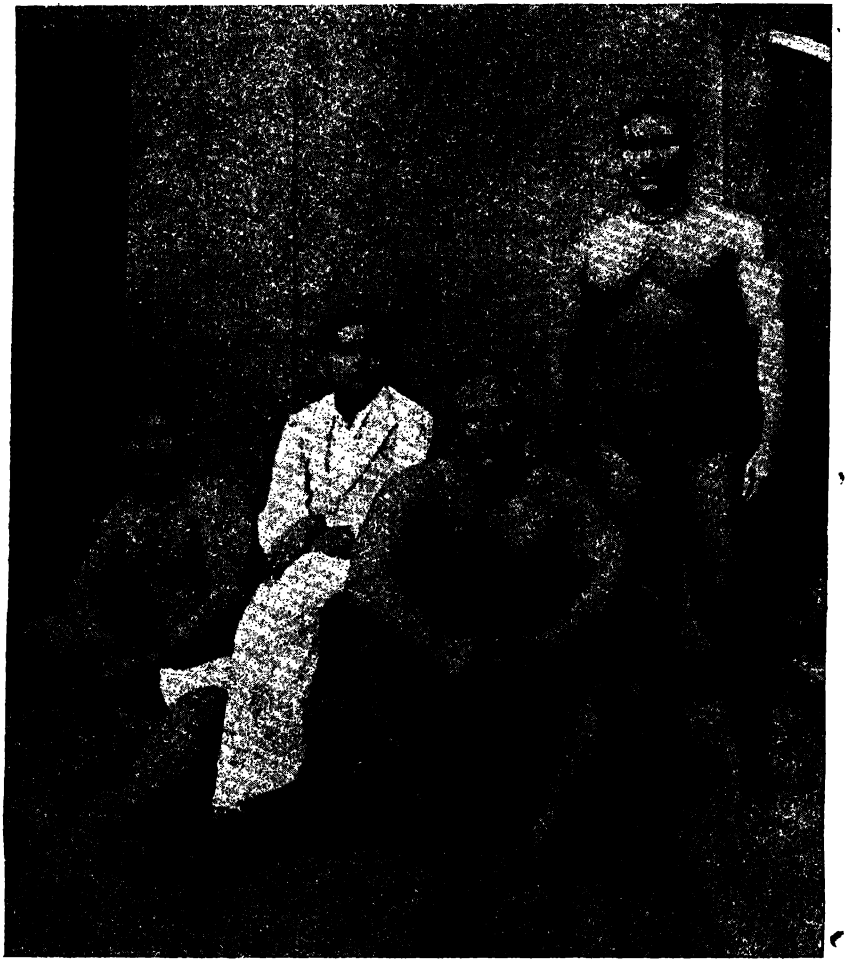

ছোট গামা। পাশে হামিদা দাঁড়িয়ে।

গিরির লোভ সামলাতে পারেনি, এবং বৃদ্ধ বয়সে অবস্থাও তাদের বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গুজরাঁওয়ালা শহর—লাহোর, মুলতানের মত কুস্তির একটা পুরানো আড্ডা। যে রহীমের কথা আমি গোড়ার দিকে বলেছি, তাঁরও বাড়ী এই শহরে। তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে গেলাম। বৃদ্ধ হলেও রহীমের দেহ তখনো বেশ পটু, কিছুদিন আগেই তিনি এক জোয়ান সাহেব কুস্তীগীরকে তিন মিনিটে হারিয়েছেন। কথায় কথায় আমি বল্লাম যে, গামার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ আমি দেখেছি। রহীম বল্লেন, গামা পুরুষসিংহ, তাঁর কাছে হার মেনে আমি একটুও ক্ষুণ্ণ হইনি, বা নিজেকে অপমানিত বোধ করিনি। রহীমকে আমি খালি-গায়ে দেখেছি, কিন্তু তার খালি-গায়ের ছবি কোথাও দেখিনি। আমার বহুকালের ইচ্ছা তাঁর ছবি সংগ্রহ করি, তা আর হয়ে ওঠেনি।

রহীমের কীর্ত্তির কথা একটু বেশী ক'রে বলা উচিত। তাঁর মত পহলবান আর ভারতে জন্মাবে কিনা সন্দেহ। কুস্তির যে-রকম পতন হচ্ছে ও তার স্থান য়ুরোপীয়ের খেলার দ্বারা পূর্ণ হচ্ছে, আমার মনে হয় যে, গামা, ইমাম প্রভৃতিও গত হ'লে আর এঁদের সমকক্ষ যোদ্ধা জন্মাবে না, অন্ততঃ বর্ত্তমানকালের জোয়ানদের মধ্যে সে লক্ষণ দেখা যায় না।

রহীম অনেক যুদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর কয়েকটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর উল্লেখ করব। আগেই বলেছি, রহীম ছিলেন ওস্তাদ গুলামের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। মল্লেরাই বলে, তাঁর মত চতুর ও কৌশলী মল্ল এ-দেশে আর হয়নি। রহীমের সবই ছিল···শক্তিশালী দেহ, অপরাভূত

সাহস, কৌশল, যা সকল মল্লের কাম্য, কিন্তু ছিল না কেবল ভাগ্য। আরো কয়েকজন রহীমের মত দুর্ভাগা মল্ল ছিলেন, তাঁরা যেন অপরকে বড় করবার জন্যই জন্ম নিয়েছিলেন। অবশ্য, এ-কথাও ঠিক যে, গামার মত সৌভাগ্য নিয়ে কোন মল্ল জন্মাননি। অমন যে গুলাম, তিনিও কিক্কড়কে আয়ত্ত করতে না পেরে, প্যারিসে আহমদ মদ্রালীর শক্তিতে অভিভূত হয়ে কটু কথা শুনেছেন, হাজার হাজার লোকের সামনে অপমানিত হয়েছেন ; ইমাম বখ্‌শের মত বিরাট মল্লকেও গুঙ্গার কাছে হারতে হয়েছে। গামাই শুধু মল্ল-জগতে একমাত্র ব্যতিক্রম, যাঁকে সৌভাগ্যলক্ষ্মী কোনদিন ত্যাগ করেনি।

রহীমের যৌবনকালে তাঁর সমকক্ষ যোদ্ধার অভাব ছিল না। কাজেই বোঝা যায়, সেকালে মল্লশ্রেষ্ঠ হওয়া কত কঠিন ব্যাপার ছিল। রহীম যেমন অনেক দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিকে জয় করেছেন, তেমনি তাঁকে পরাজয় স্বীকারও করতে হয়েছে। তিনি হেরেছেন সবসুদ্ধ চারবার। তার মধ্যে দু'বার যাকে বলে, technical অর্থাৎ পাকে-চক্রে হার, সে-কথা পরে বলছি।

তিনি প্রথম হারেন, গুঙ্গার বাপ গামু বালীওয়ালার কাছে। এ-ঘটনা ঘটেছিল, বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ শহরে। গামু তখন নবাব-সরকারের মল্ল ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পরাজয় হয়, সুবিখ্যাত মল্ল গুলাম কাদিরের কাছে।

গামার বিরুদ্ধে রহীম চারবার যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু কোনবার গামাকে আয়ত্ত করতে পারেননি। ওঁদের প্রথম শক্তি পরীক্ষা হয়েছিল, দতিয়া শহরে। কুড়ি মিনিট যুদ্ধের পর ফল হয় সমান সমান। গামার অভ্যুত্থান এই সময় থেকে। ইন্দোরে এঁদের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়,

কিন্তু তিন ঘণ্টাতেও কোন ফল নির্ণয় হয়নি। তৃতীয়বার যুদ্ধটা হয় লাহোরে, তাতেও দু'ঘণ্টা দশ মিনিটে কারো হার-জিত হয়নি। এলাহাবাদে এঁদের শেষ দেখা, সে-যুদ্ধের বর্ণনা আমি আগেই করেছি। এইখানে রহীমের প্রথম পরাজয়। কারণ, আঘাত লাগার জন্য রহীম যুদ্ধ থেকে বিরত হন, এবং প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে গামা জয়ী হন।

রহীম যাঁদের পরাজিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোক কয়েকটি, প্রত্যেকেই তখনকার কালের নামজাদা প্রথম শ্রেণীর মল্ল। তাঁদের নাম রজ্জাব, কাদ্‌র্ বখ্‌শ্ বজ্জা, বিদ্দো পণ্ডিত, গোরা পরতাবা, কালা পরতাবা, চম্মন কসাই ইত্যাদি। বিদ্দোর কথা উল্লেখ করেছি। রহীমের এই প্রতিদ্বন্দ্বী-দলের মধ্যে কালা পরতাবা আমেরিকা গিয়েছিলেন ও বড় বিস্কোর সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা লড়ে পরাজিত হয়েছিলেন।

রহীমের বৃদ্ধ বয়সের কীর্ত্তি আশ্চর্য্যজনক। গুঙ্গা পহলবানের খ্যাতি এখন ভুবনবিদিত। এখন ত' গুঙ্গার বয়স হয়েছে, কিন্তু গুঙ্গা যখন পূর্ণ যুবা, সেইসময়ে রহীম তাঁকে অবলীলায় পরাজিত করেন। এই মল্লবীরের বয়স তখন ষাট বৎসর। ক্যানেডিয়ান মল্ল হড্‌সনকে যে আরো বেশী বয়সে তিনি অবলীলায় পরাজিত করেছিলেন, সে-কথা উল্লেখ করেছি।

১৯১৮ সালে কোল্‌হাপুরের বিরাট দঙ্গলে যখন গামা নিজের ভারতীয় পদবীটা ভাই ইমামের স্বপক্ষে ত্যাগ করেন, তখন বৃদ্ধ রহীম ইমামকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন ইমামের উঠ্‌তি বয়স, তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য্যও উদয়াচলে, রহীম মাত্র আট মিনিটে পরাজিত

হন, কিন্তু এই পরাজয়টাও গামার কাছে পরাজয়ের মত—পাকে-চক্রে। এইটাকেই 'রুস্তম-ই-হিন্দ' হবার জন্য তাঁর শেষ যুদ্ধ বলা যায়।

রহীম অপরের কাছে নিশ্চিতভাবে হেরেছেন। গামা-ইমাম অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ মল্ল হলেও তাঁকে সে-রকম ক'রে হারাতে পারেননি। পাকে-চক্রে হার, নিয়মানুসারে হার বটে, কিন্তু তাতে অক্ষমতার চেয়ে, দুর্ভাগ্যের কথাটাই বেশী ক'রে মনে হয়।

আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়, গামু, করীম প্রভৃতি অন্যান্য বৃদ্ধ পহলবানের মত রহীম সুস্থ দেহে ও শান্তিতে দিনাতিপাত করছেন। বৃদ্ধ হলেও তাঁর শক্তি যে একেবারে ক্ষুণ্ণ হয়নি, এ-কথা সুনিশ্চিত।

তেরো

পেশাদারী কুস্তি প্রতিযোগিতায় বিচারক হওয়া সুখের কাজ নয়। সময়ে সময়ে বিচারকদের খুবই মুস্কিলে পড়তে হয়। প্রতিযোগীদের ভেতর ঝগড়া ত' আছেই, কুস্তিদর্শকদের স্বভাবও খুব শান্তশিষ্ট নয়। আগেকার কালে গোলমাল যতটা হ'ত, আজকাল তার চেয়ে ঢের বেশী হয় সাম্প্রদায়িক কারণে, সেইজন্য প্রতিযোগিতা করবার হুকুম দিতে পুলিশের কর্ত্তারা এখন সতর্ক হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ঘটবার কারণ থাকলে তাঁদের অনুমতি পাওয়া যায় না। অথচ মজা এই যে, মল্লদের ভেতর এখনো সাম্প্রদায়িকতা নেই বল্লেই চলে, যত-কিছু গোল ঘটে তা দর্শকদের ভেতর।

বিচারের কাজ করতে গিয়ে আমি দু'বার বিপদে পড়েছি। শিয়ালকোটে থাকতে একদিন চুন্নীর কাছ থেকে একটা ছোট-খাটো প্রতিযোগিতার বিচারক হবার নিমন্ত্রণ পেলাম। স্থানটা ছিল শহরের মাঝখানে। বিকেলবেলা দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে সেখানে গেলাম। একটা চাকর খানকয়েক চেয়ার নিয়ে গেল, কারণ সেখানে বসবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

বিরাট একটা পুরাণো-কালের বাড়ী, তার সামনে অসম্ভব ভীড়। বাড়ীর ফটকটা দুর্গের ফটকের মত বিশাল, সেটা বন্ধ রাখা হয়েছিল। ফটকের গায়ে ছোট একটি কাটা-দরজা, দর্শকেরা তার ভেতর দিয়ে এক এক ক'রে ঢুকছে, কিন্তু আমাদের ঢোকা অসম্ভব হ'ল। শেষে প্রতিযোগিতার কর্ত্তারা ভিড় সরিয়ে বড় ফটকটা একটু ফাঁক ক'রে

আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখি, মস্ত এক আঙিনা, সেটার চারদিকে একতলা বাড়ী। আঙিনাতে পহলবানদের বিরাট সমারোহ। একদিকে চুন্নী করীম নিজেদের দলবল নিয়ে ব'সে, অন্য-দিকে পর্ব্বতাকার গুঙ্গা, তার বাপ গামু বালীওয়ালা ও সদ্‌রা প্রভৃতি গুঙ্গার ভাই ও চেলার দল উবেরয়দের কারখানায় ইনায়ৎউল্লা ব'লে এক অত্যন্ত সুপুরুষ ছোকরা কাজ করত, সে ছিল চুন্নীর শিষ্য। যেমন তার চেহারা, তেমনি তার কুস্তির কৌশল। আমি তার কৌশল দেখবার জন্য সত্যই উদ্‌গ্রীব ছিলাম। ইনায়ৎ আমার কাছে এসে বস্‌ল।

আঙিনার মাঝখানে কুস্তি আরম্ভ হ'ল। অনেক প্রতিযোগীর তখনও শিক্ষার্থীর অবস্থা, কিন্তু তাহ'লে কি হয়। পঞ্জাবে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের দেহের রক্তে কুস্তি মিশে গেছে, শিক্ষার্থীরাও যে-ভাবে লড়ে, বাঙালীর ছেলের সে নিরিখ পর্য্যন্ত পৌঁছোতে বহুকাল লেগে যায়। খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটা 'জোড়' শেষ হ'ল।

শিয়ালকোটে নবাব ব'লে একজন মল্ল আছে। লোকটা দেখতে সুন্দর, কৌশলী, কিন্তু তার মেজাজ কিছু উগ্র। সে বড়-একটা আমোদ পাবার জন্য সোজাসুজি লড়ে না। তার মতলব, প্রতিযোগীর দৈহিক ক্ষতি করা, বা তার সঙ্গে গায়ে-প'ড়ে ঝগড়া বাঁধানো। লোকটা আবার জাতিতে কসাই। তার সঙ্গে লড়তে এসেছিল লাহোরের একটি হৃষ্টপুষ্ট ছোকরা। দু'জনে আখাড়ায় নেমে হাতে হাত দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই নবাব সহসা ঘুরে গিয়ে তার হাতে মোচড় দিলে আর সশব্দে লোকটার ডান হাতটার হাড় ভেঙে বেকিয়ে পড়ল। কিন্তু তার এমন

বন্দীদের গল্প

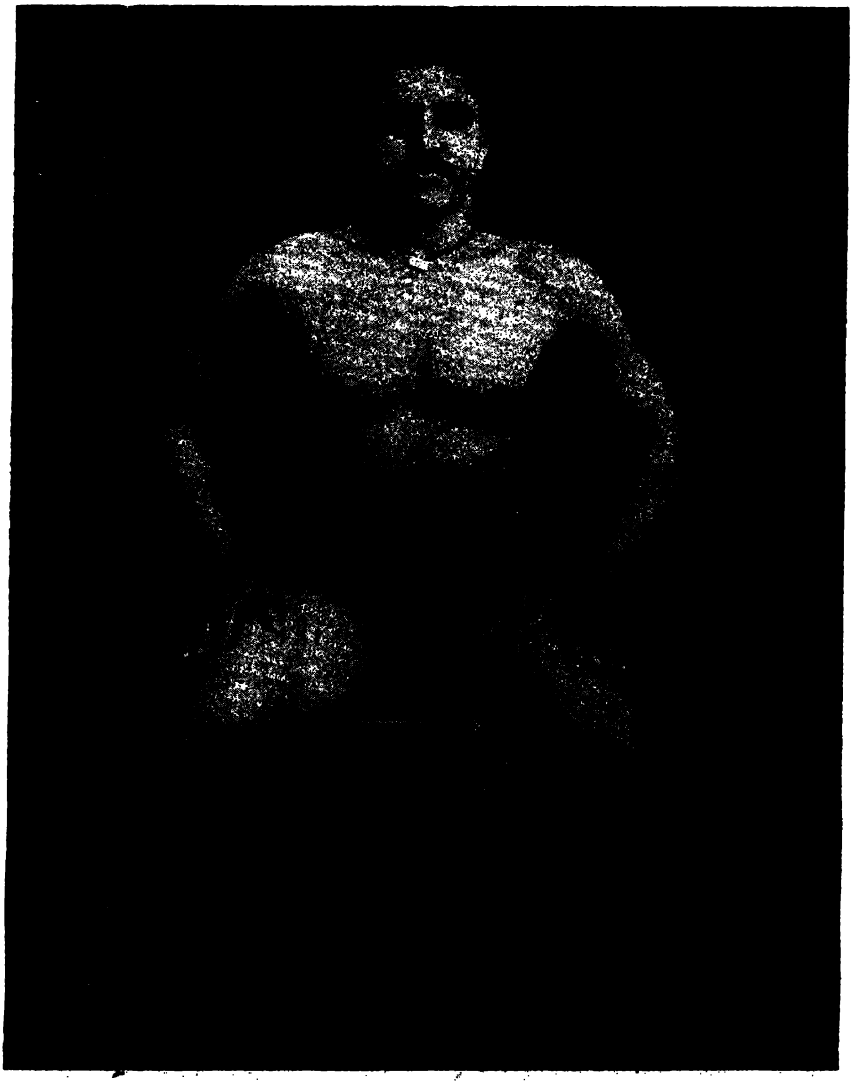

ইনায়ৎউল্লা

সাংঘাতিক সহ্য শক্তি যে, বেদনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও তার মুখ দিয়ে একটা কাতরানি শব্দ বেরোলো না। এই ঘটনা ঘটবার সঙ্গে-সঙ্গে আঙিনার একটা কোণে হঠাৎ মারামারি বেধে গেল। লাঠির ব্যবহার ত' হলোই, দূর থেকে দেখলাম, একটা বড় ছোরা ঝল্‌সে উঠল এবং একজন লোক নিমেষে রক্তাপ্লুত হয়ে গেল। আমার যে বিষম ভয় হ'ল, তা না বল্লেও চলে। একে এই ঠাঙাড়ের দল, তার ওপর ইঁদুর-কলের মত একটা বাড়ী, পালাবারও কোন উপায় নেই। একমাত্র ভরসা যে, আমার বিচারের কোন ত্রুটির জন্য মারামারি হয়নি। পুলিশ ছিল মাত্র চার-পাঁচ জন। চুন্নী আমার কাছে বসেছিলেন, বল্লেন, কোন ভয় নেই; রক্তারক্তি এখনি বন্ধ হয়ে যাবে। হলোও তাই। জনকয়েককে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেল এবং প্রতিযোগিতাও আবার আরম্ভ হ'ল।

হামিদা ব'লে একটি সুগঠিত লাহোরের ছোকরা, ইনায়তের সঙ্গে লড়লে। দুইজনেরই কৌশল অপূর্ব্ব। মিনিট-পনেরো পরে হামিদা পরাস্ত হ'ল, কিন্তু সে বল্লে, তার হার ঠিক হয়নি। তর্ক-বিতর্ক হবার আগেই ইনায়ৎ হাসতে হাসতে বল্লে—বেশ, আবার লড়, এবার তোমাকে খুশী ক'রে দেব। আবার ওদের কুস্তি চল্লো। দু'জনেই কৌশলী ও ক্ষিপ্র, কুস্তি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম, চারদিক থেকে বুড়ো ওস্তাদেরা বাহবা দিতে লাগল; প্রায় কুড়ি মিনিট পরে হামিদাই আবার হেরে গেল।

পরদিন সর্দ্দার উবেরয়ের কাছে খুব বকুনি খেলাম। তিনি বল্লেন—তুমি বিদেশী লোক, এখানে এসেছ ছুরির ঘায়ে প্রাণ

হারাতে ! কথা দিতে হ'ল যে, কুস্তি যতই দেখি না কেন, বিচারকের কাজ কোন মতেই করব না।

লিখতে ব'সে কারখানার দু'টি পাঠান ছেলের কথা বার বার মনে পড়ছে। দু'জনেরই বয়স ১৩।১৪, কিন্তু মল্লকৌশল চমৎকার। আমি তাদের মাঝে মাঝে পয়সা দিতাম এবং তারা রাস্তার ধারেই লড়ে দেখাতো। শেষে এমন হ'ল যে, যখন-তখন আমার অফিস-কামরার দরজায় তারা এসে দাঁড়াতো এবং লড়ার হুকুমের জন্য অনুনয় করত, কাজেই সপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন তাদের কুস্তি দেখতেই হ'ত। গরীবের ছেলে, সামান্য মাইনে পেত, খাওয়াও বোধকরি সামান্য, কিন্তু দেহ তাদের যেমন চমৎকার, লড়বার কায়দাও তেমনি। অতটুকু বয়সে কঠিন কঠিন দাঁও-প্যাঁচ তারা আয়ত্ত করেছিল। সেদিন কলকাতায় বাঙালী ছেলেদের প্রতিযোগিতা দেখতে দেখতে আর পৃষ্ঠপোষকদের লম্বা লম্বা কথা শুনতে শুনতে এই দু'টি ছেলেকে মনে পড়ছিল। যদি কলকাতায় একজনকেও অমন পড়তে দেখতাম, সত্যই খুশী হতাম, কিন্তু কুস্তির নামে যা দেখলাম তা আর যাই হোক, কুস্তি নয়।

এলাহাবাদে বছর বছর নিখিল-ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু তাতে কোন বড় মল্ল প্রতিযোগী হিসাবে যোগ দেন না। কারণ, তাঁদের যত টাকা দিতে হয়, এলাহাবাদের মত ছোট শহরে তত টাকা তোলা খুবই শক্ত কথা। একবার গামাকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল, তাঁর দলসুদ্ধ এসে কুস্তি দেখিয়ে যাবার জন্যে। গামা এলেন এবং তাঁর সঙ্গে এলেন ইমাম, হামিদা, বস্‌সা, জমালা, সাহাবুদ্দীন প্রভৃতি ভারতের বড় বড় পহলবান। এখানকার লোক অত্যন্ত উৎসাহিত

হ'য়ে উঠল। এলাহাবাদ হচ্ছে, তীর্থের জায়গা। গামার বাংলোটাও একটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো। হাজার হাজার লোক সকাল-সন্ধ্যা গামার বাড়ীতে তাঁকে দেখবার জন্যে হাজিরি দিতে লাগল।

রোজই গামার সঙ্গে দেখা করবার কথা মনে করতাম এবং রোজই ভীড়ের ভয়ে দেখা করাটা স্থগিত রাখতে হোতো। শেষে একদিন বিকালবেলা আমার দু'টি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্র ও অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে ধ'রে নিয়ে গেলেন। গামা যে বাংলোটা ভাড়া করেছিলেন, সেটা গঙ্গার ধারে এক নির্জ্জন জায়গায়, সামনের বাড়ীটাই বড় এবং তার পেছনে চাকরবাকর থাকবার ও গাড়ী রাখবার জন্য একটা ছোট বাড়ী, যেমন সব বাংলোর সঙ্গেই থাকে; বড় বাড়ীটার সামনে জনমানব নেই দেখে মনে ভাবলাম, ওস্তাদকে একাই পাব, কিন্তু বাড়ীর পিছনে গিয়ে আমার সে ভুল ভাঙ্‌ল। দেখি, সেই দারুণ গরমে গামা গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে রোদে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে, মুখ দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, আর কয়েক শত ভক্তদর্শক নির্ব্বাক হয়ে ভারতের এই পুরুষসিংহকে দেখছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে রাজা-বাদশাহেরা প্রত্যহ সকালে ঝরোখায় দাঁড়িয়ে প্রজাদের দর্শন দিতেন, গামাকে এখন সেই প্রথাটা মেনে চলতে হয়। এমন সম্প্রদায়ের লোক এ-দেশে নেই, যারা গামাকে শ্রদ্ধা করে না বা, ভালবাসে না; গামাকেও এমনি ক'রে দর্শন দিতে আমি কোনদিন বিরক্ত হতে দেখিনি।

আমি গামাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করলাম। গামা আমাদের

নিয়ে সেই ছোট বাড়ীটার একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করলেন, ভীড়ের জন্য তাঁর বড় বাড়ীটায় থাকা চলে না। গামা ধনী ব্যক্তি, কিন্তু চক্‌চকে পাড়ের শাড়ী ও রঙিন পাগড়ী পরা ছাড়া তাঁর মনে কোন সখ নেই। কাজেই, ঘরে দেহভারে-শিথিল একটা দড়ির খাট ছাড়া আর কিছু ছিল না। বসবার, বা কথা কইবার আগেই বিরাট ভীড়টি ঘরের প্রবেশপথটি বন্ধ ক'রে দিলে, বুঝি-বা অন্ধকূপ হত্যার ব্যাপারটা আবার ঘটে! কোনরকমে ভীড় ঠেলে আবার পহলবানকে নিয়ে বাইরে এলাম, গামা বল্লেন—'সকালবেলা আসবেন, ন'টা আন্দাজ, তখন ভীড় থাকে না।' আমি কোনরকমে সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন আমরা নানা বিষয়ের আলোচনা করলাম এবং বিশেষ ক'রে গামার নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। সাধারণতঃ পঞ্জাবী পহলবানদের লোকে চাষা ব'লে মনে করে। এ-কথা সত্যই যে, ওদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি, লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না, কিন্তু গামার বিষয়ে সে-কথা বলা চলে না। তাঁর কথাবার্ত্তা চমৎকার, তাছাড়া গামা অত্যন্ত বিনয়ী। নিরক্ষর হলেও গামার জ্ঞান বেশ বিস্তৃত। বিশেষ ক'রে ব্যায়ামের বিষয়ে এমন কথা গামার মুখে শুনেছি, যা ব্যায়াম-বৈজ্ঞানিক ছাড়া অন্য লোকের মুখে শোনবার আশা করা যায় না।

গামা আমাকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে খাবার কথা বলতেন! কোনদিন না খেলেও সকলের খাওয়াটা আমি বিশেষ লক্ষ্য করতাম। গামা এলাহাবাদে বাস করবার সময়ে রোজ ৩০৲ টাকা খোরাকি পেতেন। কিন্তু খাওয়া দেখে একদিন আমাকে বলতেই হ'ল যে,

সব লোকের খাওয়াতেও, ত্রিশ কেন, দশটা টাকাও খরচ হয় না। মোটা মোটা দু'চারখানা রুটি আর খানিকটা ক'রে মাংস—এই ছিল আহারের ব্যবস্থা। গামা হাসতেন আর বলতেন, 'জানেন ত' সবই, আবার জিজ্ঞাসা করা কেন!'

কোন বড় কুস্তির জন্য তৈরী হবার প্রয়োজন না থাকলে আমাদের মল্লেরা বেশী পয়সা খরচ ক'রে খায় না, যদি সে পয়সা নিজের গাঁট থেকে খরচ করতে হয়। অন্যে দিলে অবশ্য আলাদা কথা, তখন খাওয়া বা খরচের কোন সীমা থাকে না। পহলবানদের খাওয়ার যা বিরাট বিরাট ফর্দ্দ শোনা যায়, সেটা সাধারণতঃ দোকানদারীর কথা। তবে এ-কথা ঠিক যে, গড়ে ওঠবার কালে ও প্রতিযোগিতার সময়ে খাওয়ার খরচ খুবই বেশী হয়ে থাকে। ইনায়ৎ গরীব লোক, কিন্তু তার তখন training-এর কাল ব'লে তার দৈনিক খাওয়ার খরচ ছিল, তিন টাকা।

গামার পায়ে তখন একটা ঘা ছিল ব'লে তিনি ব্যায়াম করতেন না কাজেই আমার কিছু দেখবার সুযোগ হচ্ছিল না, দেখা হ'লে আমরা কেবল গল্পই করতাম। অবশ্য অন্যান্য পহলবানদের দেখা যেতে পারত, কিন্তু গামার সঙ্গে সকলের ব্যায়াম দেখাটাই আমার খুব আগ্রহের বিষয় ছিল। পহলবানেরা অত্যন্ত ভোরে উঠে কুস্তি লড়ে, আমার বাড়ী অনেকটা দূরে ব'লে তা দেখার সুযোগ হচ্ছিল না। গামার ঘা সারল, তিনি আমাকে কুস্তি দেখতে যাবার কথাও বলতে লাগলেন।

আমার ইচ্ছা ছিল, আমার বাড়ীতে দলটিকে এনে গামা ও ইমামকে অভিনন্দন দিই ও কিছু উপহার দেবার ব্যবস্থা করি। সেই উপলক্ষ্যে

আমি আমার বন্ধুদের একত্র করছি, এমন সময়ে কুস্তি প্রতিযোগিতার কর্ত্তা এক স্কচ ভদ্রলোকের কাছ থেকে চিঠি এলো যে, গামাকে আমি যেন নিমন্ত্রণ না করি, কারণ, ওঁদের সর্ত্ত অনুযায়ী গামা কোনও অভিনন্দন ইত্যাদি নিতে যেতে পারেন না। গামা ইতিপূর্ব্বে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে অভিনন্দন নিয়েছেন, ছাত্রদের উপদেশও দিয়ে এসেছেন, নিষেধ শুনে আমি তাঁর কাছে যেতে বাধ্য হলাম। তিনি বল্লেন, সাহেব তাঁকেও সর্ত্তের কথা মনে করিয়ে দিয়ে কোথাও যেতে নিষেধ করেছে। আমাদের সব ব্যবস্থা পণ্ড হ'ল। নিষেধের ব্যাপারটা কিন্তু অনেক দূরে গড়ালো এবং আমার সঙ্গে গামার বিচ্ছেদের সূচনা হয়ে দাঁড়াল একদিন।

তখন বর্ষাকাল, একদিন সকাল চারটের সময় একটি ছাত্র তাঁর গাড়ী নিয়ে ফটক থেকে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন, শুনলাম, তাঁকে নিয়ে গামার কাছে যেতে হবে। যখন ওস্তাদের আড্ডায় উপস্থিত হলাম, তখনো অন্ধকার, মল্লরা কেউ মুখ ধুচ্ছে, কেউ আলো জ্বেলেই ব্যায়াম করছে। অত ভোরেও আমার দু-একটি ছাত্র সেখানে উপস্থিত হয়েছে। গামার দলে বস্‌সা লোকটার প্রকৃতি অত্যন্ত রুক্ষ, সে একজন সাহেবকে ধাক্কা মেরে বল্লে, এখানে আসবার হুকুম নেই, বেরিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে মারামারি ত' করা যায় না, আমি গামার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম, তিনি তখন হাত দুলিয়ে বৈঠক করছেন, সব কথা ব'লে আমি চলে আসবার উপক্রম করছি, গামা আমার হাত চেপে ধ'রে বল্লেন—আমি ত' জানিনি যে আপনি

এসেছেন। সাহেব (কুস্তি প্রতিযোগিতার কর্ত্তা) এখানে কাউকে আসতে দিতে মানা করেছেন, কাজেই ওরা সকলকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

আখাড়ার ধারে একটা চারপাই পেতে আমাকে তার ওপর জবরদস্তি বসিয়ে দিয়ে গামা অন্য সকলকে ডেকে আনলেন ও আমাকে বল্লেন—এখনি খুশী ক'রে দেব। জগতের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি, দুর্দ্ধর্ষ মল্ল আখাড়ার ধারে এসে দাঁড়ালো। গামা গুরু, সকলকে নিত্য লড়ানো তাঁর কাজ, তাঁর সঙ্গে প্রথমেই যে ভিড়ল তার নাম, বস্‌সা পহলবান, গামা ছাড়া সকলের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। বস্‌সা জোয়ান-বয়সে খুব নামজাদা মল্ল ছিল, আমি যখন তাকে দেখি তখন তার বয়স প্রায় চুয়ান্ন বছর, কিন্তু তখনো কি বিক্রম! যেমন তার শক্তি, তেমনি তার ক্ষিপ্রতা, অথচ তখন তার দৈহিক ওজন গামার চেয়ে অনেক বেশী। আধ ঘণ্টা দাঁও-প্যাঁচ ধস্তাধস্তির পর বস্‌সা বিশ্রাম নেবার জন্য আখাড়ার ধারে বসল। তারপর গামার সঙ্গে যে ভিড়ল তার নাম—সাহাবুদ্দীন।

সাহাবুদ্দীনের মত লম্বা-চওড়া জোয়ান আমার চোখে আর পড়েনি। আমি ওর নাম রেখেছিলাম, ভারতের প্রাইমো কার্ণেরা। দৈর্ঘ্যে, ওজনে, ছাতির মাপে সাহাবুদ্দীন গামার চেয়ে অনেক বেশী। হ'লে কি হয়, অত-বড় দৈত্যের মত মানুষ, কিন্তু গামা তাকে একটা শিশুর মত নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। একবার সাহাবুদ্দীন গামাকে সুমুখ থেকে জাপ্‌টে ধরলে, গামা এক ধাপ পা বাড়িয়ে শুধু তাঁর বিশাল বুকটা চিতিয়ে দিলেন আর সাহাবুদ্দীন ছিটকে আখাড়ার একপাশে গিয়ে পড়ল। আর-একবার গামা নীচে এসে পড়লেন

এবং সাহাবুদ্দীন তাঁর ওপর প'ড়ে প্যাঁচ করবার চেষ্টা করতে লাগল, গামা প্যাঁচ কাটাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না ক'রে ওই বিরাটকায় মল্লকে

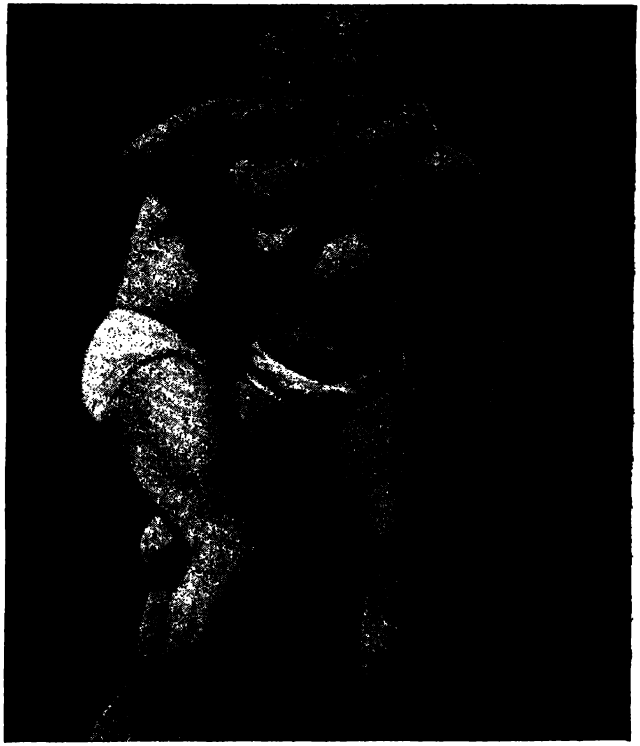

সাহাবুদ্দীন ও হামিদা

পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবশ্য ২৪০ পাউণ্ড ওজনের মানুষকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়ানো এমন কিছু শক্ত কথা নয়, আমরাও পারি, কিন্তু ওই ওজনের একটি চতুর মল্ল যখন অপরের ওপর চাপ দেয়, তখন

তাকে তোলা, ভিন্ন ব্যাপার···হাতী তোলার মত বিরাট শ্রম ও শক্তির কাজ। সাহাবুদ্দীন যখন ব'সে পড়ল, তখন সে কামারের হাপরের মত জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, আর গামার দেহে শ্রমের কোন চিহ্ন নেই।

তারপর এলো গামার ভাগ্নে, গুলাম মুহীউদ্দীনের পালা। তাকে দেখলে হেসে গড়াগড়ি দিতে হয়, তখন তার বয়স মাত্র বাইশ বছর, কিন্তু তাহ'লে কি হয়, দেহটি পর্ব্বতের মত। লোকটা যেন বৃত্ত দিয়ে তৈরী, সবই তার গোলাকার। দেহের তুলনায় মাথাটি কয়েৎ-বেলের মত ছোট, আর পেটটি একটি মস্ত জালার মত। লোকটি নেহাৎ ভালমানুষ। তার যা কিছু স্ফূর্ত্তি ওই লড়বার সময়ে, অন্য সময়ে সে তার আয়তন নিয়েই কাতর, সর্ব্বদাই গরমে হাঁসফাঁস করছে। কিন্তু গায়ে তার অমানুষিক শক্তি। শুধু গামার সঙ্গে সেদিন লড়বার সময়ে তার শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল না, কয়েকদিন পরে যে প্রতিযোগিতা হ'ল, তাতে সে শুধু গায়ের জোরে পূরণ সিংকে চেপে আখাড়ায় শুইয়ে দিয়ে অবলীলায় চিৎ ক'রে দিলে। মামা-ভাগ্নেতে খানিক যা যুদ্ধ হ'ল, তার প্রথমটায় মনে হ'ল, ভাগ্নে বলে ও কৌশলে মামার সমান। কিন্তু শেষে, ধোবায় যেমন মাথার ওপর কাপড় তুলে পাটে আছড়ায়, মামাটি ভাগ্নেকে তেমনি ক'রে এক বিরাট আছাড় মারলেন! ওই প্যাঁচটারও নাম 'ধোবিয়া পছাড়', কেউ কেউ বলে, 'ধোবি পাট'।

খুব বড় দেহ হ'লে বিশেষ ক'রে গ্রীষ্মকালে যে কষ্ট হয় তা সকলেই জানে। পঞ্জাবে বা যুক্তপ্রদেশে শীতটা খুবই বেশী, কিন্তু পহলবানেরা সে-সময়েও আদ্দির জামা প'রে পাখার বাতাস খায়। অবশ্য, সকলেই

এ-কাণ্ড করে না, যাদের দেহ বিরাট আর মেদবহুল, তাদেরই এই দশা। আমি কিঙ্কড় সিংকে পৌষ মাসে হাত-পাখা ব্যবহার করতে দেখেছি। গুলাম মুহীউদ্দীন বেচারার কষ্টটা আরো বেশী এবং সে কি ক'রে এই কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করে সেটা লেখবার মত।

একদিন একটু বেলায় গামার সঙ্গে দেখা করতে গেছি, সেদিন যেমন কাট-ফাটা রোদ্দুর আর তেমনি গরম। বাড়ীর বাইরে জনমানব নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, হঠাৎ কোথা থেকে কে বল্লে—'সলাম জী!' চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই, আবার শুনলাম 'সলাম জী!' কোন অশরীরী আত্মা, বা মানুষ সেলাম জানাচ্ছে কি না জানবার জন্য বাগানে নেমে গেলাম। খুঁজতে খুঁজতে আখাড়ার ধারে বড় একটা নিম গাছের তলায় দাঁড়াতেই আবার শব্দ এলো—'সলাম জী!' দেখি, মাটি থেকে মুহীউদ্দীনের ছোট্ট ন্যাড়া মাথাটি বেরিয়ে আছে আর বাকি দেহটা মাটিতে পোঁতা। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, গরমের জ্বালায় সে স্বেচ্ছায় নিজেকে ভিজে-মাটিতে কবর দিয়েছে!

গামা যে কখনো হেরেছেন, এ-কথা তোমরা কেউ কখনো শোননি, আমিই কেবল তাঁকে চিৎ হতে দেখেছি। সেদিন সকালে সকলের সঙ্গে গামা একে একে লড়লেন, সবসুদ্ধ চৌদ্দজন সেদিন উপস্থিত ছিল। তারপর তাঁর সঙ্গে লড়লে, ইমামের বড় ছেলে। বয়স তখন তার বারো বছর। দিব্য গোলগাল মজবুত চেহারা, এখন সে বড় হয়েছে এবং প্রকাশ্যভাবে সাধারণ দঙ্গলে লড়তে আরম্ভ করেছে। তার লড়া সাঙ্গ হ'লে, লড়তে এলো ইমামের আর-এক পুত্র, তখন তার বছর-আটেক বয়স। তার কি স্ফূর্ত্তি! জ্যাঠার থামের মত পা নিয়ে টানাটানি করতে করতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলে। জ্যাঠা মাটিতে

উপুড় হয়ে পড়লেন আর ক্ষুদ্র ভাইপোটি বিদ্যুৎগতিতে তাঁর পিঠে সওয়ার হয়ে ঘাড়ে প্যাঁচ ক'রে গামাকে চিৎ করবার চেষ্টা করতে লাগল, একটু পরেই সে জ্যাঠাকে চিৎ ক'রে দিলে! গামা বল্লেন—"সাবাস!" অন্য পহলবানেরাও তাকে সাবাসী দিতে সে আনন্দে নাচতে লাগল!

তারপর গামা সকলের সঙ্গে লড়তে লাগলেন, অর্থাৎ তিনি রইলেন একদিকে আর অন্যদিকে বাকি কয়জন। এই ধস্তাধস্তি হ'ল প্রায় দশ মিনিট কাল। পহলবানেরা এই কাণ্ডটা করে, দম করবার জন্য, এবং বোধকরি এর অন্য-একটা লক্ষ্যও আছে, সেটা পরে বলব।

এই পরিশ্রমের পর গামা আমার কাছে এসে বসলেন, তখন ইমাম ও হামিদা লড়তে আরম্ভ করলে এবং ইমামও বড় ভাইয়ের মত সকলকে লড়িয়ে দিলে। গামা আমাকে বল্লেন, ইমাম-হামিদার সঙ্গে আজ লড়লুম না কেন জানেন? আপনি লেখক মানুষ, বড় জোয়ান কাউকে প'ড়ে যেতে দেখলে না-জানি কি লিখে দেবেন, কারণটা তাই। খুব খানিক হাসি-গল্পের পর সেদিন উঠে পড়লাম।

আর-একদিন গেলাম ওদের সকলের দেহ মাপজোপ করতে। গামাকে অন্য-একদিন মাপলাম আর ওজন করলাম, কিন্তু ইমামের আর দেখাই পাওয়া যায় না। তাঁর খুব তিতিরপাখী পোষার সখ। যখনই যাই, শুনি, ইমাম তিতির চরাতে গেছেন। তিতির লড়িয়ে পাখী, আমাদের এদিকে তিতিরের লড়াই লেগেই আছে। কাজেই তিতিরকে কার্য্যক্ষম রাখবার জন্য অনেক তোয়াজও করতে হয়। যারা ওই পাখী পোষে, তারা পাখীটাকে রাস্তায় বা মাঠে ছেড়ে দেয়, আর পাখীটা ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। পাখীকে ব্যায়াম করাতে অনেক সময় লাগে।

কাজেই ইমামকে মাপজোপ করতে আমাকে একদিন ঘণ্টা-কয়েক অপেক্ষা করতে হ'ল। শুধু এদের মাপ নেওয়া আর ওজন করা হ'ল না। একদিন সকলের অনেক ছবি নিলাম। এমন কি, গামা-ইমামের পারিতোষিকের একটা রূপোর গদা ওজন করাও বাদ দিলাম না।

এইরকম মাপ নেবার সুযোগ পেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় মল্লদের বাহু, দেহের অনুপাতে খুব বৃহৎ নয়, বরং অপেক্ষাকৃত রোগাই বলতে হবে। যাদের ব্যায়াম করার অভ্যাস আছে, তাদের অনেকেই তার বাইসেপ্স্ দেখাতে ব্যস্ত। সৌভাগ্যক্রমে মল্ল সম্প্রদায়ের মধ্যে এ অভ্যাস দেখতে পাওয়া যায় না, ওরা জানে মানবদেহের কোন্ অংশটা প্রকৃত শক্তির পরিচায়ক, তাই তারা নূতন মানুষ দেখলেই তার উরুর গঠন দেখতে চায়। বাইসেপ্স্ দেখানো অভ্যাসটা আমরা য়ুরোপীয় ব্যায়ামীদের কাছে শিখেছি। আমার বিশ্বাস, যাদের গায়ে জোর যত কম, তাদেরই বাইসেপ্স্ দেখানোর ঝোঁক তত বেশী। আমার এ বিশ্বাস হয়েছে, কলকাতার ব্যায়ামাগারে ঘুরে ঘুরে, বাঙালী ব্যায়ামীদের দেখে। তাদের অধিকাংশেরই ব্যায়াম করা বৃথা, কেননা, প্রকৃত শক্তি চর্চ্চা করার ঝোঁক অল্প লোকেরই আছে, এবং সে-কথা বুঝিয়ে দেবার লোকও খুবই কম।

হামিদা দুর্দ্ধর্ষ মল্ল, কিন্তু তার বাহুর মাপ পনেরো ইঞ্চির কিছু বেশী মাত্র, আর উরুর মাপ, ছাব্বিশ ইঞ্চি। ইমামের মত পহলবান ভারতে আর জন্মাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁর ডান বাহুর মাপ, পনেরো, আর বাম বাহুর মাপ, সাড়ে পনেরো ইঞ্চি। ইমামের সাধারণ বুকের মাপ, আটচল্লিশ আর উরুর মাপ, সাতাশ ইঞ্চি। এদের শক্তি কোথায় তা সহজেই বোঝা যায়। পা তৈরী করতে এরা বহু-

কাল ধরে দারুণ পরিশ্রম করে, কিন্তু কখনো "কার্ল্" বা ঐ জাতীয় কিছু ওদের করতে দেখলাম না। দেহের তুলনায় ইমামের বাহু কিছুই নয়, ডান বাহুতে কোনকালে অনেক ফোড়া হয়েছিল, এখনো সাত-আটটা বড় বড় অস্ত্র করার দাগ বর্ত্তমান, বাহুটাও অন্য বাহুর চেয়ে রোগা। এখন ইমাম বৃদ্ধ, মাথার চুল পাকতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু এমন জোয়ান সারা জগতে নেই যে, ইমামের সামনে দাঁড়াতে পারে। আমি যত বড় বড় পহলবান দেখেছি, সকলের বিষয়েই এই এক কথা বলা যায় যে, দেহে শক্তির কেন্দ্র কোথায় তা তারা বোঝে ; বাঙালী যুবকদের মত বাহুর পরিধি বাড়াতে গিয়ে সময়ের অপচয় করে না। ওদের মধ্যে নিত্য নূতন শক্তিশালী পুরুষ জন্মায়, কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতের মধ্যে শক্তি কি, এই সত্যটার উপলব্ধিই এখনো হ'ল না।

ওদের মাপজোপ যেদিন করি ও ছবি তুলি, সেদিনের সকালটা আমার খুব আনন্দে কেটেছিল। সকলেরই মাপ দেবার ও ছবি তোলাবার সে কি উৎসাহ! হামিদা প্রভৃতি সকলেই স্নান ক'রে চক্‌চকে সাটিনের জাঙিয়া প'রে আমার সামনে এসে উপস্থিত। একে-একে অনেক ছবি তোলা হ'ল। গামার যে রাঁধুনী, সেও ছবি তোলবার জন্য এসে হাজির। সাহাবুদ্দীন তাকে অবলীলায় দু-হাতে মাথার ওপরে তুলে দাঁড়াল, আমিও সে ছবিটা নিলাম। দুঃখের বিষয়, সব ছবি আশাপ্রদ হ'ল না।

গামার এই রাঁধুনীটি বড় যে-সে লোক নয়। কুস্তি সে লড়তে জানে, কিন্তু রান্নার ওস্তাদীই তার বড় ওস্তাদী। তার তৈরী খাবারের গুণে মল্লদের দেহ গড়ে ও শক্তি বজায় থাকে, কারণ, আজীবন ধ'রে

সে এই বিশেষ রন্ধন-কৌশল শিখেছে। এরকম রাঁধুনী না হ'লে কোন পহলবানেরই চলে না, কাজেই সকল দলেই এরকম এক-একজন ওস্তাদ থাকে। আমাদের গোবরবাবুর কাছেও এইরকম এক ওস্তাদ খলিফা ছিল, তাকে গোবরবাবু অনেক টাকা মাইনে দিতেন, এবং সেও অত্যন্ত যত্ন ক'রে গোবরবাবুকে তৈরী করেছিল। সব দেখে-শুনে আমার মনে হয়, সত্যিকারের পহলবান হতে গেলে যেমন নিষ্ঠা দরকার, অর্থেরও তেমনি দরকার আছে এইসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্য। শুধু নিষ্ঠা বা শুধু অর্থ দিয়ে বড়-দরের বিশেষজ্ঞ মল্ল হওয়া সুকঠিন ব্যাপার। একজন ভাল পহলবান তৈরী করতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার দরকার।

ইমামের রূপোর গদাটি একদিন ওজন করলাম, সেটার ওজন হ'ল, এগারো সের। গদাটি সুনির্ম্মিত, তাতে সোনার তারের কাজও খানিকটা আছে। দু'ভাইয়ের এইরকম নয়টি গদা আছে। নানা কৃতিত্বের জন্য রাজা মহারাজারা সেগুলি তাঁদের উপহার দিয়েছেন। আমি যেটা ওজন করেছি, সেটা ইমাম পেয়েছিলেন বোধ হয় রহীমকে হারিয়ে, 'রুস্তম' হয়ে এবং সেটা দান করেছিলেন, কোল্‌হাপুরের মহারাজা।

এই দলের মধ্যে সাহাবুদ্দীনকে আমার অত্যন্ত ভাল লাগত। অত ভালমানুষ আর সরল লোক সাধারণতঃ দেখা যায় না। আমার কেবলই মনে হ'ত, সাহাবুদ্দীনের ওপর সব বিষয়েই বিশ্বাস রাখা যায়, কপটতা ওর কাছ-ঘেঁসেও যায় না। সে অত-বড় দুর্দ্ধর্ষ মল্ল, কিন্তু ওর যেন নিজের বিরাট শক্তির কোন উপলব্ধি নেই! সংসারে সাহাবুদ্দীন ভিড়ের ভিতর নিজেকে লুকিয়ে রাখে, কিন্তু

আখাড়ায় ও ভিন্ন ব্যক্তি। ওকে যারা আয়ত্ত করেছে তারা সত্যই খুব বড় মল্ল।

ইতিমধ্যে এখানে কুস্তি-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল। গামার দলের ছোট ছোট কয়েকজন, ও বড়র মধ্যে গুলাম মহীউদ্দীন তাতে যোগ দিলে। বলা বাহুল্য, এই দলের সকলেই শিক্ষার গুণে জয়ী হ'ল। মুহীউদ্দীন কেবল গায়ের জোরে অত নামজাদা মল্ল পূরণ সিংকেও পরাস্ত করলে।

শেষ দিন গামা নিজের দল নিয়ে নামলেন, কুস্তিটা হ'ল সম্পূর্ণ-ভাবে লোকশিক্ষার জন্য। গামা, ইমাম, হামিদা, বস্‌সা সাহাবুদ্দীন ও জমালা সকলে মিলে কিছু কিছু দাঁও-প্যাঁচ দেখালেন, দশহাজার লোক মুগ্ধ হয়ে সে-কৌশল দেখতে লাগল। সবচেয়ে বেশী কৌশল দেখালে, হামিদা ও ইমাম। মিনিট-কুড়ি পরে গামার দলের কাজ শেষ হ'ল।

গামার উপস্থিতির জন্য অনেক টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। আগেই বলেছি, খোরাকের জন্য গামা রোজ তিরিশ টাকা পেতেন, একমাস ধ'রে তিনি এই টাকা পেয়েছিলেন। শেষ দিনের জন্য তাঁকে দেওয়া হ'ল, এক হাজার টাকা।

গামার বাংলোয় অত ভিড় হবার আর-একটা কারণ ছিল। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম, গামার কাছে হাঁপানির নাকি খুব ভাল ওষুধ আছে। অনেক লোক সেই ওষুধ নিতে যেত। আমার পরিচিত এক মুসলমান ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে, সে ওষুধে তাঁর বিশেষ উপকার হয়েছিল।

চৌদ্দ

বড় বড় মল্লদের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ করলাম বটে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা যেমন, কাহিনীও তেমনি অফুরন্ত। এ-কথা খুবই সত্য

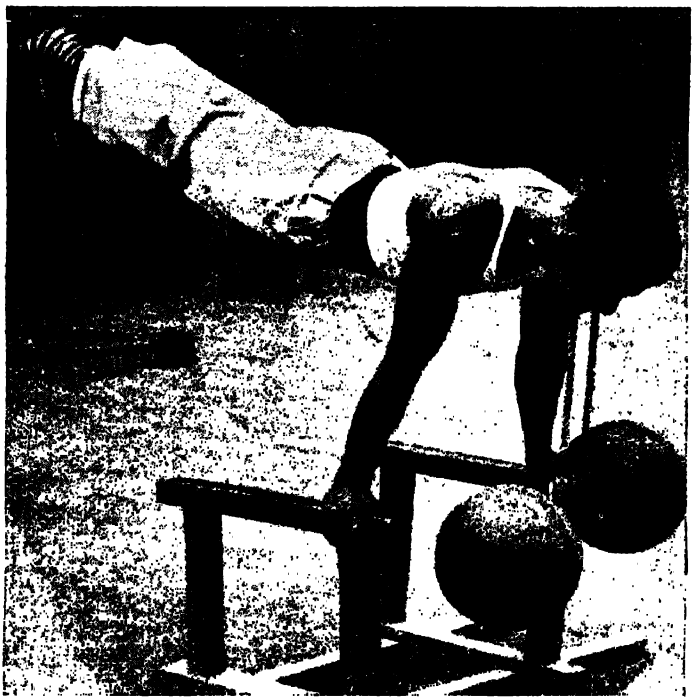

বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী-জিম্‌নাস্ট্‌
মণি রায়

যে, তাঁরা না থাকলে আমাদের দেশে যে অসীম শক্তিশালী মানুষ জন্মায়, সে-কথার কোন প্রমাণ দেওয়া চলত না। এইবার অন্য

ধরণের ছোট-খাট শক্তিকামী জনকয়েক ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া যাক্। বলা বাহুল্য, যাঁদের আমি নিজে দেখেছি, তাঁদের কথাই বলব।

ভারতের আদর্শদেহ ব্যায়ামী
কে, ভি, আইয়ার

কেননা, এ-ধরণের লোক আমাদের দেশে সংখ্যাতীত। তারই মধ্যে দু'চারজনকে একটু অসাধারণ বলা যেতে পারে।

কুস্তি ছাড়া শক্তি-গড়ার অন্যতম ব্যায়াম, ভারোত্তোলন। জিম্‌ন্যাস্টিক্‌স্ শক্তি গড়ে না, কিন্তু জিম্‌ন্যাস্টদের মধ্যে অনেক কৌশলী লোক দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল সার্কাস কমে গিয়ে এই য়ুরোপীয় ধারার কৌশলী খেলোয়াড়দের সংখ্যাও দ্রুত কমে যাচ্ছে।

পেশাদার ভারোত্তোলক আমাদের দেশে আমি মাত্র একজনকে দেখেছি, তার নাম—উলিয়েৎ। লোকটির দেশ বোধকরি পণ্ডিচেরী শহরে, জাতিতে সে ফ্রেঞ্চ-ইণ্ডিয়ান। কোনো একটা সার্কাসের সঙ্গে উলিয়েৎ এলাহাবাদে আসে। মূলতঃ সে ভারোত্তোলক হলেও, সার্কাসে সে গোটাকয়েক শক্তির খেলা দেখাতো। বিজ্ঞাপন হিসাবে তার বারবেলগুলো সার্কাসের দরজায় প'ড়ে থাকত, কিন্তু তাকে আমি ভার তুলতে দেখিনি, জানিনা সে তার সব-চেয়ে ভারী ওজনগুলো তুলতে পারত কি না।

উলিয়েতের চেহারাটি গোলগাল মোটাসোটা। পেশীর কোন বিশেষ বিভাজন-রেখা তার দেহে নেই। উলিয়েৎ বুকের ওপর একটি ক্ষুদ্রকায় হাতীর ভার বহন করত। কিন্তু সেকালে তার খ্যাতি হয়েছিল, অন্য কারণে। পেরেকের শরশয্যায় পিঠে রেখে শুয়ে, বুকে একটা বড় ঘোড়ার ভার বইতে আমি প্রথম তাকেই দেখি। ব্যাপারটা শক্তির পরিচায়ক যতটা না হোক, সহনশীলতার অদ্ভুত পরিচয় বটে। আমি কিন্তু এই বিপজ্জনক খেলাটায় কোনদিন আমোদ পাইনি। এখন শরশয্যায় শয়ন করা একটা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার গায়ে এক কড়ারও বল নেই, এমন লোকও শরশয্যায় শুয়ে লোকের কাছে হাততালি পায়। তবে উলিয়েতের সমকক্ষ বিশেষ কেউ হতে পারেনি, কারণ, তার ঘোড়ার দেহভারটা অগ্রাহ্য করবার মত ব্যাপার ছিল না।

শরশয্যায় শয়ন করা আমাদের দেশে একটা পুরোনো ব্যাপার, বহু শতাব্দী থেকে অসংখ্য হঠযোগী এইরকম শয্যায় শুয়ে এসেছে। আজও প্রয়াগে কুম্ভ অথবা মাঘ মেলায় এ-ব্যাপারটা যথেষ্ট দেখতে

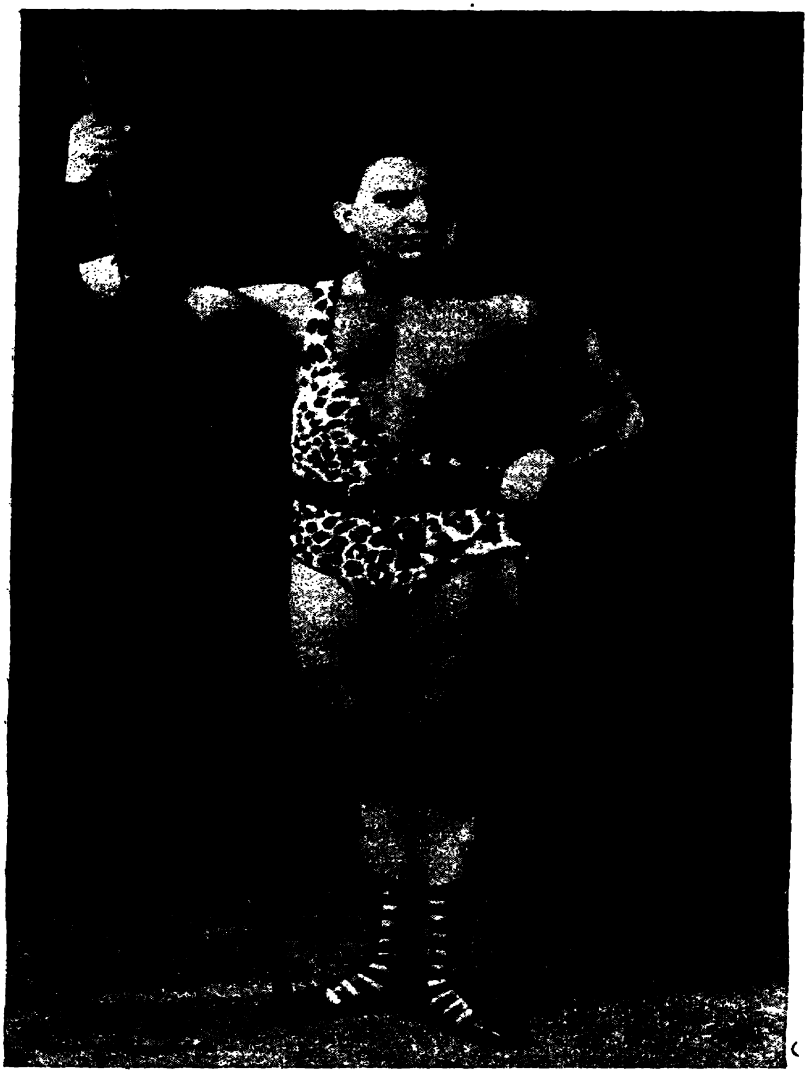

বর্ম্মার শক্তিমান ও দৈহিক সৌষ্ঠবশালী ব্যায়ামী
রবার্টসন্

পাওয়া যায়। কিন্তু শরশয্যায় শুয়ে বুকের ওপর গুরু-ভার রাখার প্রচেষ্টা—ভারতীয় কি না বলা যায় না। এখন নানারকমের শক্তি বা সহনশীলতার ব্যাপার য়ুরোপ থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে ব'লে য়ুরোপীয়রা দাবী করে। শরশয্যায় শুয়ে বুকে প্রথম ভার বহন করার দাবী করে একজন রুষীয়-তুর্কিস্থানের লোক, তার কল্পিত নাম—স্যামসন, আসল নামটা আমার মনে নেই।

এইরকম একটা দাবীর অন্য উদাহরণ দেওয়া যায়। বাংলা-দেশে যারা পেশীশাসন করে, তারা পেশীশাসনের তথা-কথিত প্রবর্ত্তক ম্যাক্সিককে দেবতার মতন মানে, ছেলেবেলা আমিও তাই করতাম। ম্যাক্সিক বিগত-যুগের একজন নামজাদা জার্ম্মান ভারোত্তোলক, তাঁর বাড়ী, ব্যাভেরিয়া প্রদেশে। ১৯১০ সালে ম্যাক্সিক প্রথম লণ্ডনে যান ও নিজের পেশীশাসনের কৌশল দেখান। তাঁর পেটের পেশী-শাসন দেখে লোক যেমন মুগ্ধ হয় তেমনি আশ্চর্য্যও হয়। ম্যাক্সিকের দাবী ছিল যে, এই বিশিষ্ট ব্যাপারটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। দু' এক বৎসরের মধ্যে তাঁর সব কৌশল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাঙালী ব্যায়ামীরাও সেগুলো য়ুরোপীয় ব্যায়াম ব'লে শেখে।

অথচ মজা এই যে, পেটের পেশীশাসনের ব্যাপারটা হাজার হাজার বছরের পুরোনো এবং হঠযোগধারার অন্তর্গত। ওর প্রথম অবস্থার নাম—উড্ডীয়ন, দ্বিতীয়টার নাম—নৌলি। নৌলির মধ্যমা, বাম ও দক্ষিণ বিভাগ আছে। অনেক এমন প্রমাণ আছে, যাতে জোর ক'রে বলা যায় যে, য়ুরোপীয় অনেক ব্যায়ামধারা ভারতের ও চীন দেশের পুরোনো ব্যায়াম-ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু পেশীসঞ্চালনবহুল হয়ে প'ড়ে সেগুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেছে।

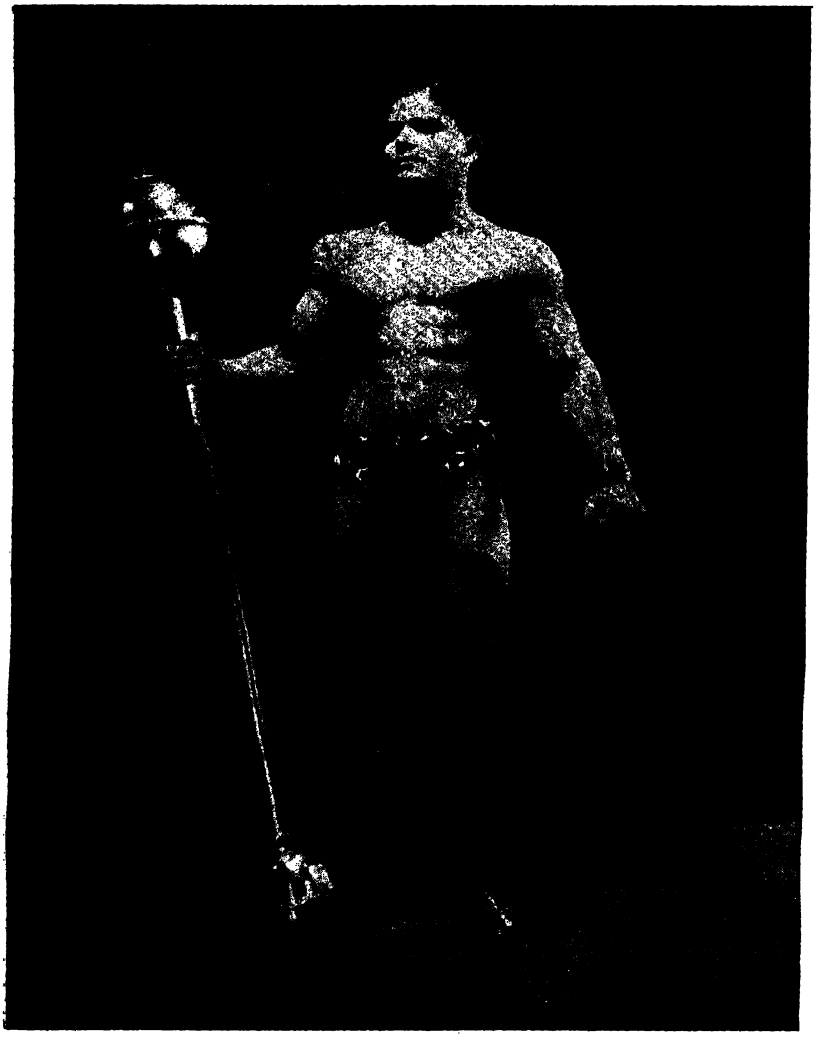

বোম্বাই-এর সুদর্শন ব্যায়ামী

চার্ণী

শরশয্যার ব্যাপারটাও আমার তাই ব'লে মনে হয়। কিন্তু শরশয্যায় শুয়ে, বুকে ভার রাখলে, পিঠের চামড়া ফেটে যায় না কেন? এ-কথা বলতে পারি না, কারণ এ-বিষয়ে আমার নিজের কোন

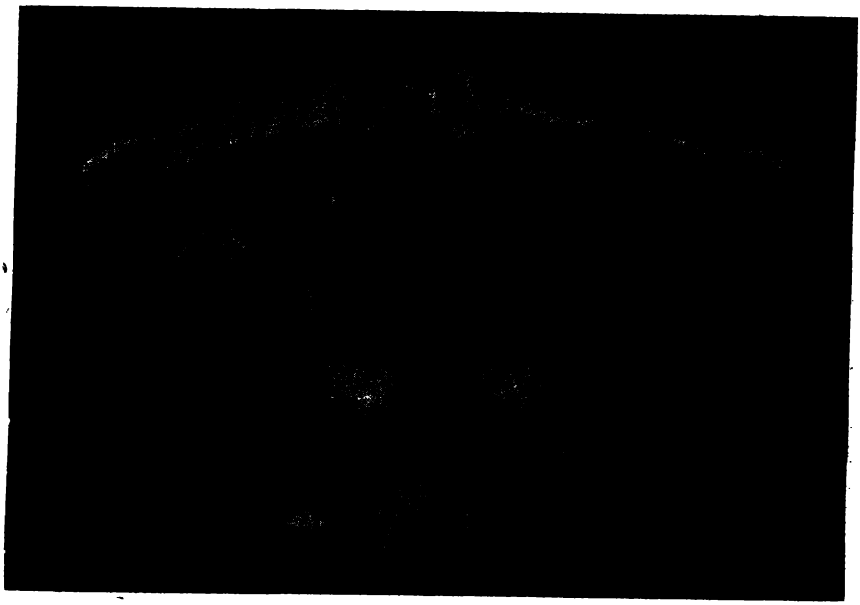

বাংলাদেশে পেশীশাসন বিদ্যার প্রবর্ত্তক
ওয়ালটর চিত্তুন

অভিজ্ঞতা নেই। উলিয়েৎকে দেখে কৌতূহল মেটাবার জন্য আমি একবার ইংরেজ ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ পুলামকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনিও আমাকে এর কারণ বলতে পারেন নি।

বাংলা দেশে রাজেন গুহ ঠাকুরতার নাম সুপরিচিত। মানুষটি

অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় হলেও ভীষণ বলবান। তিনি কয়েকবার বুকে হাতী রেখে অমানুষিক সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। যাকে bone strength বলে, রাজেন বাবুর তা পর্য্যাপ্তরূপে ছিল। বাংলা দেশে ব্যায়ামের অনেকটা প্রসারের জন্য রাজেন বাবু সাক্ষাৎভাবে দায়ী, তিনি জিমন্যাস্টিক্স্-এর পুনঃপ্রবর্ত্তন করেছেন। আধুনিক প্রথায় ভারোত্তোলনে একসময়ে বাঙালীর ছেলের কিছু পটুত্ব ছিল। কিন্তু এর প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাধান্য লোপ পেয়েছে। আমাদের কাজ হয়েছে, ভার-তোলার সংঘ গ'ড়ে অন্য জাতির ছেলেদের কৃতিত্ব দেখে হাততালি দেওয়া ও গুরুগিরি করা। ভার-তোলায় বাঙালী প্রতিযোগীর সংখ্যা সন্তোষজনক নয়। যারা কিছু পটুত্ব দেখিয়েছিল এবং সত্যকারের দৈহিকশক্তির অধিকারী

বিশিষ্ট বাঙালী বলী জ্ঞানদাস দত্ত

হয়েছিল, তাদের মধ্যে জ্ঞানদাস দত্ত প্রধান। তিনি বিশিষ্ট বলী, সারা এশিয়ায় সর্ব্বপ্রথম ৩০৮ পাউণ্ডের ভার মাথার ওপর তোলেন। বর্ত্তমান কালে জ্ঞানবাবুর মত শক্তিধর পুরুষ বাঙালী জাতির মধ্যে নেই এবং ভারতবর্ষেও অত্যন্ত কম আছে। আমি অবশ্য মল্লদের বাদ দিয়ে এ-কথা বলছি।

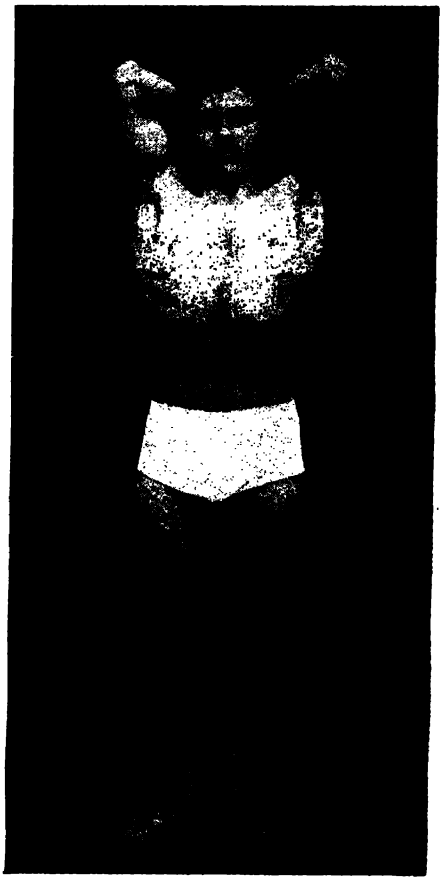

আদি ভারথন

আমার মতে উত্তর মালাবার প্রদেশের পল্লীকুন্নু গ্রামের আদি ভারথনের মত ভারোত্তোলক আমাদের দেশে আর হয়নি। ভারথন কয়েক-বার কলকাতায় প্রতিযোগিতা করেছেন। তাঁর দৈহিক ওজন হিসাবে কয়েকটি বিভিন্ন কায়দায় তিনি যা ভার তুলতে সক্ষম হয়েছেন, পৃথিবীর নিরিখ হিসাবে ভারথনকে তাঁর শ্রেণীর দ্বিতীয়-পর্য্যায়ে ফেলা যায়। বলা বাহুল্য, আর কোন ভারতীয় ভারোত্তোলকের বিষয়ে এ-কথা বলা যায় না।

লাহোরের মহম্মদ নকী ভারোত্তোলনে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। প্রথম শ্রেণীর ভারোত্তোলক হবার শক্তি তাঁর দেহে আছে, এবং তাঁর ভার-তোলা ভারতীয় নিরিখ হিসাবে অসাধারণ।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমার কাছে হেণ্ডরসন নামে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এসেছিল ও কিছুদিন আমার ব্যায়ামশালায় ব্যায়াম অভ্যাস করেছিল। এই ছেলেটির মত চৌখশ ব্যায়ামী সহজে চোখে পড়ে না। ভার-তোলা, কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদি সকল বিষয়েই তার যথেষ্ট পটুত্ব ছিল। তার মধ্যে কুস্তির পটুত্ব সমধিক। Acrobaticsএও হেণ্ডরসন যথেষ্ট কৌশলী ছিল। দরিদ্র না হ'লে হেণ্ডরসন নামজাদা বলী হতে পারত। পেটের দায়ে সে অত্যন্ত অল্প বেতনে এক সার্কাসে চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুর যায়, তারপর আমি তার আর কোন সংবাদ পাইনি।

পনেরো

১৯৩৬ সালের প্রারম্ভে ভারতীয় মল্লদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা যায়, তার কারণ, সুবিখ্যাত জার্ম্মান কুস্তিগীর—ক্রেমার। সে-সময়ে কিন্তু ক্রেমারের কোন খ্যাতি ছিল না। এই কৌশলী জার্ম্মান মল্ল তার সমস্ত খ্যাতিটা এই দেশে অর্জ্জন করেছে। ১৮৯২ সাল থেকে আজ-পর্য্যন্ত অনেক বিদেশী মল্ল ভারতে এসেছে, কিন্তু ক্রেমার ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জয় লেখা হয়নি, সকলেই নিরাশ হয়ে নিজের দেশে ফিরে গেছে।

ক্রেমার আগে ছিল য়্যামেচার মল্ল। ১৯৩২ সালের অলিম্পিক গেম্‌স্‌-এ সে রুমানিয়ান মল্ল আর্ণল্ড্‌ কোশীশের কাছে পরাজিত হয় ব'লে শোনা যায়। তার কিছুকাল পরে ক্রেমার নিজের দেশে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, পেশাদার মল্ল হিসাবে ঈজিপ্ট ও টার্কিতে ভ্রমণ ক'রে। লাহোরে সে মাস-তিনেক ভারতীয় কুস্তি অভ্যাস করবার পর ছোট কোন মল্লের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা না ক'রে প্রথমেই গুঙ্গার সঙ্গে লড়ে। একজন অপরিচিত অখ্যাত সাহেব পহলবান আমাদের দেশে একেবারে বড় বড় মল্লের সঙ্গে লড়তে পায়, তার কারণ তার সাদা চামড়া, এবং আমাদের মল্লদের বিনা পরিশ্রমে কিছু অর্থ রোজ-গার করবার লোভ। সেই কারণে গুঙ্গার মত পহলবানও ক্রেমারের সঙ্গে লড়তে সম্মত হয়।

কুস্তি হয়—লাহোরে। আমি এ কুস্তি দেখিনি, কিন্তু তার অব্যবহিত পরে লাহোরে গিয়ে সমঝদার লোকের কাছে ক্রেমারের

সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ মল্ল
ফন্ ক্রেমার

যুদ্ধের বিষয় শুনেছি। গুঙ্গাকে যে ক্রেমার জব্দ করতে পারে এ-কথা গুঙ্গার মতই দশ হাজার দর্শকের মধ্যে একজনও বিশ্বাস করতে পারেনি। শোনা যায়, গুঙ্গা যখন ক্রেমারকে ধরেছিল, এই জার্ম্মানটির অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে দর্শকেরা হায় হায় ক'রে উঠেছিল। কিন্তু বিধি ছিলেন ক্রেমারের অনুকূল। সে বিরাটকায় গুঙ্গাকে মাত্র আড়াই মিনিটে ভূপাতিত ক'রে, সারা ভারতকে স্তম্ভিত ক'রে দেয়। গুঙ্গার ওপর লোকে এত বিরক্ত হয়েছিল যে, কিছুকাল তার নিজের গ্রাম থেকে শিয়ালকোট শহরে আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এই আড়াই মিনিটে ক্রেমার যে বিরাট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, তার কোন তুলনা দেওয়া সম্ভব হয় না।

ক্রেমারের হাতে গুঙ্গার পরাজয়ের মত এ অবিশ্বাস্য ঘটনা যে কি ক'রে ঘটল, তার ব্যাখ্যা বন্ধুবর গোবরবাবু আমাকে দিয়েছেন। এ-কথা সকলেই জানে যে, ভারতীয় ও ইংরেজি প্রথায় মল্লযুদ্ধে খানিকটা পার্থক্য আছে। আমি অবশ্য ইংরেজি "Catch-as catch-can" প্রথার কথাই বলছি। ভারতীয় মল্লেরা বিদেশীয়দের সঙ্গে এই প্রথায় লড়তে বাধ্য হয়, কিন্তু বরাবর জয়ী হয়ে এসেছে ব'লে এই প্রথার কিছুই শেখবার দরকার মনে করে না। গুঙ্গার পরাজয়ে কিন্তু এবার তাদের চোখ খুলে গেছে। দুটো প্রথার প্রধান কি তফাৎ তাও এ-ক্ষেত্রে বলবার দরকার নেই, কেবল এইটুকু বল্লেই হবে যে, ইংরেজি প্রথায় মল্লেরা প্রথমেই 'ব্রিজ' করতে শেখে, যা আমাদের কুস্তিগীররা বোঝে না। যদি বিদেশী মল্ল কোন একটা কঠিন অবস্থা থেকে হঠাৎ ব্রিজ করবার সুযোগ পায় ও সেইসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীর

দেহের সমতা কেন্দ্রচ্যুত করতে পারে, তাহ'লে তার আত্মরক্ষা করা আর সহজে সম্ভব হয় না। সামলাতে পারে যদি যথেষ্ট অবসর পায়।

গুঙ্গা ক্রেমারকে আক্রমণ করেছিল সে-কথা আগেই বলেছি। ক্রেমার এই আক্রমণ এড়াবার সুযোগ পেয়ে অতর্কিতভাবে ব্রিজ ক'রে গুঙ্গাকে ক্ষণিকের জন্য অসহায় ক'রে দেয় এবং গুঙ্গা প'ড়ে যাবামাত্র ক্রেমার তাকে সহজেই চিৎ ক'রে দেয়।

এই যুদ্ধের ঠিক পরেই এক পঞ্জাবী পহলবান জিজ্জার সঙ্গে ক্রেমারের কুস্তি হয়। এ-কুস্তিটাও লাহোরে হয়েছিল। জিজ্জা চতুর মল্ল, নিজের চোখে গুঙ্গার দুর্দ্দশা দেখে সাবধান হয়েছিল, যুদ্ধ আরম্ভ হতেই জিজ্জা বিপুল বেগে ক্রেমারকে আক্রমণ করে এবং চতুর্থ মিনিটে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। জিজ্জা যদি সেইসময়ে অধীর হয়ে আখাড়া থেকে পালিয়ে না যেত, ক্রেমারের ভাগ্যে কি হ'ত কে জানে! ক্রেমার তখন মাটিতে চিৎ হয়ে প'ড়ে, একটা কাঁধ তখনও মাটিতে সম্পূর্ণভাবে ঠেকেনি। জিজ্জা হঠাৎ তাকে ছেড়ে, 'আমি জয়ী হয়েছি, জয়ী হয়েছি' বলে চীৎকার করতে করতে আখাড়া থেকে চলে গেল, তার সঙ্গীরাও কোলাহল ক'রে উঠল। বস্তুতপক্ষে তখনও যুদ্ধ সাঙ্গ হয়নি। বিচারকেরা জিজ্জাকে অনেক বোঝালেন, সে কিন্তু আর ফিরে এসে লড়তে রাজী হ'ল না, কাজেই যুদ্ধের ফল সমান সমান ব'লে ধ'রে নেওয়া হ'ল।

তারপর মুসৌরীতে মোইনুদ্দীন ব'লে একটি উনিশ বছরের ছোকরার সঙ্গে ক্রেমারের যুদ্ধ হ'ল। এই যুদ্ধে রামমূর্ত্তি উপস্থিত ছিলেন। মোইনুদ্দীন মাত্র শিক্ষার্থী পহলবান, কিন্তু সে আধঘণ্টা ধ'রে

ক্রেমারের আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছিল। ক্রেমার তার কিছুই করতে পারেনি।

ক্রেমার যখন কলকাতা পৌঁছোলো তখন তার ভারত-জোড়া খ্যাতি। অল্প কিছুদিন পরেই তার দ্বারভাঙ্গায় লড়বার ব্যবস্থা হ'ল। এইসময় থেকে কিছুদিন পর্য্যন্ত গোবরবাবু ক্রেমারকে চালান। গোবরবাবুর পরামর্শে ক্রেমারের যথেষ্ট লাভও হয়েছিল।

দ্বারভাঙ্গায় প্রথমেই বড় পূরণ সিংএর সঙ্গে লড়ার ব্যবস্থা হ'ল। পূরণ দ্বারভাঙ্গা-রাজের সুবিখ্যাত মল্ল। পূর্ব্বেই ঠিক হয়েছিল, ৩০ মিনিট ধ'রে কুস্তি হবে। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। প্রথমে কেউ কাকে আয়ত্ত করতে পারেনি, কিন্তু ক্রমশঃ পূরণের আক্রমণ বেশী হতে লাগল। আখাড়ার চারিদিকে দড়ির বদলে বাঁশ ঘেরা ছিল ব'লে শুনেছি। একবার ক্রেমার পূরণের আক্রমণ এড়াতে গিয়ে বাঁশের ওপর গিয়ে পড়ল, চোটও লাগল। ক্রেমার দ্বারভাঙ্গার কুমারের কাছে হাত ব্যাণ্ডেজ করবার জন্য সময় চাইলে, তাকে সময় দেওয়া হ'ল না, কাজেই এ যুদ্ধ আর শেষপর্য্যন্ত হ'ল না, পূরণকেই জয়ী ব'লে ধ'রে নেওয়া হ'ল। এই হ'ল ক্রেমারের প্রথম পরাজয়।

আর্ণল্ড কোশীশের কথা আগে বলেছি। সেও এইসময়ে ভারতে এসেছিল। লোকটি দেখতে মন্দ না হলেও, কুস্তির বিদ্যা তার অত্যন্ত সাধারণ। সে রেঙ্গুণে ছোট গামার কাছে অত্যন্ত অল্প সময়ে পরাজিত হয়ে কলকাতায় এসে ক্রেমারের সঙ্গ নেয়। কোশীশও দ্বারভাঙ্গা গিয়েছিল। তার কুস্তি হ'ল, চাঁদ খাঁর সঙ্গে। চাঁদ খাঁ খানদানী পহলবান, সে কোশীশকে অবলীলায় পরাজিত করলে। ক্রেমার পূরণের কাছে হেরে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তার ক্ষতিপূরণ করবার

জন্য কুমার সাহেব চাঁদ খাঁর সঙ্গে কুস্তির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কুস্তির ফলাফল সমান সমান হয়েছিল বটে, কিন্তু চাঁদ খাঁ ক্রেমারকে নাস্তানাবুদ ক'রে ছেড়েছিল।

তারপর গোবরবাবু এই জার্ম্মান মল্লকে নিয়ে কোল্‌হাপুরে গেলেন। সেখানে ক্রেমার দু'জনের সঙ্গে লড়ে, একজনের নাম আমার মনে নেই। দুটো যুদ্ধই সমান সমান হলেও, তড়াকার সঙ্গে ক্রেমার লড়ে খুশী হয়নি। তড়াকা ক্রেমারকে নানারকমে ব্যতিব্যস্ত করেছিল ও হাত ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল। হাতে লাগার জন্যই ক্রেমার তড়াকার কাছ থেকে বেঁচে যায়, নচেৎ তার কাছে জয়ী হবার বা সমান-সমান হবার আশা খুব কমই ছিল।

———

ষোলো

দঙ্গলের ব্যবস্থা করা খুব ঝঞ্ঝাটের কাজ হলেও, এলাহাবাদের নিখিল ভারতীয় দঙ্গলটা কয়েক বৎসর খুব জমে উঠেছিল। এই দঙ্গলটা কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী করাতেন ব'লে, ব্যবস্থাও খুব ভাল ছিল। পূর্ব্বে বলেছি, গামা একবার তাঁর দলবল নিয়ে এই দঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন, সেই থেকে এই প্রতিযোগিতার খুব খ্যাতি হয়েছিল এবং অত্যন্ত দূরদেশ থেকে পহলবানেরা এসে যোগ দিত।

ক্রেমারের খ্যাতি যখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে, এই দঙ্গলের কর্ত্তা তখন তাকে এলাহাবাদে এসে লড়বার নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু ক্রেমার ছয় হাজার টাকা দাবী করলে—যা এই ছোট শহরে কোন এক ব্যক্তিকে দেওয়া শক্ত কথা। আমাদের ইচ্ছা ছিল, এখানে ক্রেমার ও গুঙ্গার শক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, কিন্তু তা আর সম্ভব হ'ল না। অবশেষে ব্যবস্থা হ'ল, ক্রেমার এখানে য়ুরোপীয় কুস্তির ধারার কিছু প্রদর্শনী দেবে, তার মূল্য নির্দ্ধারিত হ'ল, গাড়ীভাড়া ও হোটেল খরচা বাদে তিনশত মুদ্রা।

সেবার আমি দঙ্গলের বিচারক ছিলাম, অন্য বিচারক ছিলেন, দঙ্গলের কর্ত্তা এক স্কচ ভদ্রলোক। দঙ্গলে প্রায় দু'শো জন মল্ল যোগ দিয়েছিল। সকলেই কিছু ভাল নয়, কিন্তু কয়েকজন খুব ভাল মল্ল ছিল। আনোয়ার ব'লে একটি বছর-কুড়ি বয়সের ছোকরার অঙ্গসৌষ্ঠব ও লড়ার কায়দা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাকে

দেখলেই আমার গামার জোয়ান বয়সের চমৎকার চেহারা মনে পড়ত। লাহোরের আর-একটি লোকের কুস্তি আমার খুব ভাল লেগেছিল, তার নাম—আলা ইয়ার খাঁ। লোকটি মধ্যবয়সী, দেখতেও বিরাটকায় কিছু নয়, কিন্তু আলা ইয়ারের কৌশল চমৎকার, তার কোন 'দাঁও' বা চালচলন একেবারেই শ্রমসাপেক্ষ ছিল না। তাকে কুস্তির আর্টিস্ট্ বলা যায়।

কিন্তু এই দলের মধ্যে সবচেয়ে যে নামজাদা মল্ল ছিল, তার নাম—সর্দ্দার খাঁ পঠান, তার জলন্ধরে বাড়ী। সর্দ্দারের উঠ্‌তি বয়স এবং তার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল ব'লে মনে হয়। মাদ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি শহরে যেসব আন্তর্জ্জাতিক দঙ্গল হ'য়ে গেল, তাতে সর্দ্দার যথেষ্ট নাম করেছে।

গোবরবাবু ও কোশীশকে সঙ্গে ক'রে ক্রেমার এলাহাবাদে এলো। আমি গোবরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, অন্য দু'জনের সঙ্গেও আমার আলাপ হ'ল। ক্রেমার ভাল ইংরেজি না বলতে পারলেও তার কথা কোশীশের সাহায্যে বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না। কথায়-কথায় ক্রেমার আমাকে ব'ল্লে যে, ভারতীয় পহলবানদের বুদ্ধি বড় কম। আমি আর কি বলব, কেবল তাকে জানিয়ে দিলাম যে, একবার ভাগ্যক্রমে গুঙ্গার মত পহলবান তার কৌশলে কাবু হয়েছে বটে, কিন্তু বার বার তা আর ঘটবে না। তবে ক্রেমার যে খুব চতুর আর ক্ষিপ্র, তা সেদিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল।

যাই হোক, তার পরদিন অন্যান্য কুস্তির শেষে ক্রেমার কোশীশের সঙ্গে আধঘণ্টা ধ'রে য়ুরোপীয় কুস্তি দেখালে, যার মধ্যে কথায় কথায় ব্রিজ করা আমার নূতন লাগল এবং কৌশলটাও ভাল মনে হ'ল।

আমার "গ্রীকো-রোমান" কুস্তি দেখবার ইচ্ছা ছিল, তা কিন্তু দেখা সম্ভব হ'ল না, কারণ, ওটা আর্থিক চুক্তির ভেতর পড়েনি।

ক্রেমারকে দেখার জন্য সেদিন অসম্ভব ভিড় হয়েছিল। কর্ত্তারা তাই দেখে খুব আশান্বিত হয়ে উঠলেন ও ক্রেমারও দু'হাজার টাকা

ক্রেমার 'ব্রিজ' অভ্যাস করছে

পেলে সত্যিকারের কুস্তি লড়তে পারে ব'লে জানালে কাজেই তখনি ব্যবস্থা হয়ে গেল যে, সর্দ্দার খাঁ তার সঙ্গে লড়বে।

পরদিন এই আন্তর্জ্জাতিক কুস্তি দেখবার জন্য দশ হাজার লোক একত্র হ'ল। কয়েকটা 'কুস্তি' শেষ হবার পর সর্দ্দার ও ক্রেমার

আখাড়ায় ঢুকল, এবং আমি ছবি নেবার পর তাদের কুস্তি আরম্ভ হ'ল। আমার ইচ্ছা ছিল না, সর্দ্দার হারে। যখন সর্দ্দার ক্রেমারের দিকে পিঠ দিয়ে তাকে আক্রমণ করবার ইঙ্গিত করতে লাগল, আমি আশ্বস্ত হলাম যে, সর্দ্দারও চতুর ব্যক্তি। এই রকম দু'পক্ষের চাল দেওয়াতে মিনিট-তিনেক কাটল, তারপর ক্রেমার ওপরদিকে দুই বাহু তুলে দাঁড়িয়ে সর্দ্দারকে আক্রমণ করবার লোভ দেখাতে লাগল। প্রথমবার সর্দ্দার সে-ফাঁদে পড়ল না, কিন্তু দ্বিতীয়বার তার পক্ষে এই লোভ সম্বরণ করা অসম্ভব হ'ল। যেই সর্দ্দার ক্রেমারকে আক্রমণ করলে, অমনি সে সর্দ্দারের নিজের দেহের গতি বাড়িয়ে তাকে ভূপাতিত করলে এবং এক নিমেষের জন্য সর্দ্দারের দু'টো কাঁধ মাটিতে লিপ্ত হ'ল।

ক্রেমারের সঙ্গে আসার দরুণ ও গোবরবাবুর ব্যবস্থায় কোশীশেরও অকারণে কিছু অর্থলাভ হবার সুযোগ ঘটে গিয়েছিল। আগের দিন লাহোরের মহম্মদ শফী ব'লে একটি মজবুত সুদর্শন ছোকরার সঙ্গে কোশীশের কুস্তি হয়। এ কুস্তিটা হয়েছিল, য়ুরোপীয় ধরণে অর্থাৎ কোশীশের ব্রিজ করবার অধিকার ছিল, কিছু ভারতীয় দাঁও-প্যাঁচ প্রয়োগ করা শফীর পক্ষে নিষেধ ছিল ও বিজিত ব্যক্তির পিঠ পুরা দু'সেকেণ্ড মাটিতে লিপ্ত হ'লে তবে ফল নির্ণয় হবে—এই ব্যবস্থা ছিল। শফী প্রথম আক্রমণেই কোশীশকে মাটিতে আনে এবং নানাভাবে তাকে ব্যস্ত করতে থাকে। অবশেষে কোশীশ ব্রিজের আশ্রয় নেয়। তৃতীয়বার ব্রীজ করবার সময়ে আমি শফীকে বল্‌তে বাধ্য হলাম যে, পিঠ মাটিতে না ছুঁলে চললে না। শফী অবলীলায় কোশীশকে মাটিতে চেপে ধরলে।

ক্রেমারের কুস্তি ভারতীয় প্রথায় হবার কথা ছিল। কিন্তু আমরা কুস্তি হবার পূর্ব্বে এ-কথাটা প্রচার করতে ভুলে গিয়েছিলাম। সর্দ্দার মাটিতে পড়বামাত্র দশহাজার কণ্ঠ আপত্তি ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল যে, কুস্তি শেষ হয়নি। ক্রেমার তখন আখাড়া থেকে নীচে নেমে এসে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে বসেছে। সে কি দারুণ গণ্ডগোল! আমার সাহেব সহযোগীটি তখনো মনস্থির না করতে পেরে ইতস্ততঃ করছেন। আমি তাঁকে ক্রেমারের স্বপক্ষে জয় ঘোষণা করতে বাধ্য করলাম। তাঁর মুখের কথা বার হওয়া মাত্র পিছন থেকে এক বৃদ্ধ পহলবান আমার কাঁধ চেপে ধ'রে বলতে লাগল—আপনি এ কি করলেন।

ক্রেমার ও সর্দ্দার খাঁর কুস্তির পরেই আমরা শেষ কুস্তিটা আরম্ভ ক'রে দিলাম। একে ত' জনতা উত্তেজিত, তার ওপর এ কুস্তি হ'ল হিন্দু-মুসলমানে। দু'জনের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, এমন সময়ে আবার ভীষণ গণ্ডগোল হ'ল। শহর কোতওয়াল আমাদের এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের ফলনির্ণয়টা স্থির কি না। আমরা সম্মতি জানাতে তিনি জনতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে!

অন্য কুস্তিটি আরম্ভ হ'ল। একদিকে কানপুরের আদ্ধা পহলবান, অন্যদিকে খড়ক্ সিং। আদ্ধা কৌশলী এবং অভিজ্ঞ, খড়ক্ সিং-এর বয়স কুড়ির বেশী না হলেও সে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুবক। দারুণ উত্তেজনার ভেতর তাদের কুস্তি সুরু হ'ল।

হঠাৎ আখাড়ার অপরপারে জনতার দিকে আমার নজর পড়ল। দেখি, একজন মুসলমান চোখ বন্ধ ক'রে এদিক-ওদিক দুলছে ও "য়া

অলী, য়া অলী" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠছে। তার তখন দশা-পাওয়া অবস্থা! এই অবস্থা থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে থাকে। আমি সময় শেষ হবার অনেক পূর্ব্বে আদ্ধা-খড়কের কুস্তি বন্ধ ক'রে দিলাম, কারণ একজন কেউ হারলেই তখনি যে লাঠি চলতে আরম্ভ হবে তা সুনিশ্চিত মনে হ'ল।

আমার সহযোগী আখাড়ায় উঠে পারিতোষিক বিতরণ করলেন। আমার সবচেয়ে কৌশলী মল্লের নামে দান-করা রৌপ্যপদকটা আদ্ধাকে দেওয়া হ'ল। ইতিমধ্যে দর্শকের দল বাইরে যাবার সব পথগুলি বন্ধ ক'রে ব'সে আছে। সাহেবটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, আমরা আখাড়ার একদিক দিয়ে সরকারী ছাপাখানার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম, কিছু দূর পর্য্যন্ত অনেক লোক আমাদের অনুসরণ করলে। নিরপেক্ষ বিচার করাও আজকালকার দিনে এক দারুণ পাপ। সেই থেকে আমি স্থির করেছি, এই সাম্প্রদায়িক কুস্তির ব্যাপারে আমি আর সহজে যোগ দেব না।

———

সতেরো

ক্রেমারের প্রতি আমার এত বেশী আকৃষ্ট হবার কারণ তার বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা এবং হার-না-মানা মনোভাব। ভারতীয় মল্লদের বিপক্ষে ক্রেমারের জয় অল্প, কিন্তু পরাজয় নেই বল্লেই চলে। এই মল্লদের দেশে এবং মল্লযুদ্ধের জন্মভূমিতে এসে যে-কোন বিদেশীয় মল্লের পক্ষে এটা অত্যন্ত প্রশংসার কথা। এই কারণে আমাদের দেশে আজ ক্রেমারের শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা নেই। অবশ্য যাঁরা এই জার্ম্মান পহলবানকে আমাদের প্রথম শ্রেণীর মল্লদের সমকক্ষ মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আমার মতে ঐক্য হবার কোন কারণ নেই। গুঙ্গার পরাজয় এখনো আমি একটা আকস্মিক ঘটনা ব'লে মনে করি। কারণ, ছোট অনেক মল্লকেও ক্রেমার আয়ত্ত করতে পারেনি। অবশ্য, এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, নিজের বুদ্ধির জোরে ক্রেমার অনেক ভাল পহলবানকেও ঠেকিয়ে রেখেছে।

সর্দ্দারের কুস্তির পর কলকাতায় রাজবংশী সিংএর সঙ্গে ক্রেমারের কুস্তির ব্যবস্থা হ'ল। রাজবংশী দৈত্যকার, ক্রেমারের চেয়ে দৈর্ঘ্য ও দেহের ওজনে অনেক বড় ও ভারী। আমি শুনেছি, বংশী প্রথমটা খুব মন দিয়ে লড়েনি, তার মনে হয়ত ধারণা হয়েছিল যে, অতি সহজেই এই জার্ম্মান মল্লকে আয়ত্ত করা যাবে। কিন্তু তা সম্ভব নয় দেখে বংশী বার বার ক্রেমারকে বিপুল বেগে আক্রমণ করে, অবশেষে তাকে আখাড়ার বাইরে ফেলে দেয়। আহত রক্তাপ্লুত-ক্রেমার কিন্তু তাতেও বংশীর বশ স্বীকার করেনি, যুদ্ধের ফল সমান-সমান হয় ও পরে ক্রেমারকে হাসপাতাল যেতে হয়।

১৯৩৭ সালের শেষভাগে পঁচিশজন বিদেশী মল্ল এদেশে আসে, তার মধ্যে চীনা, তুর্কি, আমেরিকান,—সব জাতির মল্ল ছিল।

এককালে নিজেদের শক্তি ও কৌশলের পরিচয় দিতে আমাদের পহলবানদের ইংলণ্ড আমেরিকা যেতে হ'ত। গামা, ইমাম, গোবরবাবু ইত্যাদির কল্যাণে বিদেশী মল্লেরা বুঝেছে যে, ভারতে না এলে সত্যকারের কুস্তি তাদের লড়াই হয় না। এই দলটির সঙ্গে আমেরিকার বিখ্যাত পহলবান ও ভূতপূর্ব্ব ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ন "স্ট্র্যাঙ্গলার" লুইসের আসবার কথা ছিল, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত তার এ-দেশে আসা হয়নি। তবুও এই দলে কয়েকটি নামজাদা মল্ল ছিল।

এ-দেশে যারা আসে তারা অবশ্য গামার সঙ্গে লড়বার লক্ষ্য নিয়েই আসে,—তার উপযুক্ত শক্তি ও কৃতকার্য্যতা তাদের থাক্ বা না-থাক্। যখন তারা আমাদের বড় মল্লদের যুদ্ধে আহ্বান করে এবং তারা সে আহ্বান গ্রাহ্য করে না, তখন আমাদের দেশে আনাড়ি ও কুস্তির বিষয়ে অনভিজ্ঞ জনসাধারণ ভাবে, আমাদের মল্লেরা বিদেশীদের ভয় পায়, তাদের চেয়ে এরা নীচু, এদের যত জারিজুরি নিজেদের ঘরে। সাহেব মাত্রেই যেন রাজার জাতি, সাহেব হলেই আমাদের শ্রেষ্ঠতম লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে তাদের যেন একটা স্বর্গীয় অধিকার আছে! আর আমাদের দেশের খুব শ্রেষ্ঠ মল্লদেরও ওদের দেশে গিয়ে, চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে লড়বার জন্য হাঁ ক'রে ব'সে থাকতে হয়, তাদের প্রমাণ করতে হয় যে, তারা এই সম্মান পাবার অধিকারী। গোবরবাবুকে লুইসের সঙ্গে লড়বার পূর্ব্বে ছ'টি বৎসরকাল এই প্রমাণ দিতে হয়েছিল। গুলাম মুহীউদ্দীন, দৌলা মহম্মদ ইত্যাদিকে আমেরিকায় গেলেও কেউ গ্রাহ্য করেনি। বলা বাহুল্য, আমি "স্টেট্স্ম্যান" পত্রিকায় এই দারুণ অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম।

কিন্তু সাহেব হলেই যে শ্রেষ্ঠ হয় না, এর প্রমাণ করলেন একজন অজ্ঞাত ও অখ্যাত ভারতীয় মল্ল, যাঁর এ-দেশের বড় পহলবানদের তালিকায় সেদিন পর্য্যন্ত কোন স্থান ছিল না।

এই বিদেশী মল্লের দল মাদ্রাজে এক বিরাট্ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে, তাতে "All-in, Greco-Roman, Catch-as-catch-can" ও ভারতীয় কুস্তিরও ব্যবস্থা হ'ল, কিন্তু মূলতঃ বিদেশী ধারার প্রাধান্যই তাতে ছিল। সর্দ্দার খাঁ পঠান, সন্তা সিং, হরবন্স্ সিং প্রভৃতি অনেক ভারতীয় পহলবান তাতে যোগদান করলে। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, "অল্-ইন্" প্রভৃতি বিহেশী ধারা আমাদের পহলবানের আয়ত্ত হয়নি, কাজেই এই প্রতিযোগিতায় ক্রেমারেরই প্রাধান্য হবে। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত হরবন্স্ সিং প্রমাণ করলেন যে, তাঁর সমকক্ষ প্রায় কেউ নেই। হরবন্স্ প্রতীচ্যের চ্যাম্পিয়ন ব'লে স্বীকৃত হলেন।

হরবন্সের বাড়ী, জলন্ধরে। দেশীয় কুস্তির ধারা অবশ্য তাঁর বাড়ীতেই শেখা, কিন্তু বিদেশী ধারাগুলি আমেরিকায় থাকতে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি সারা ভারতে ও সিংহলে গিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছেন। হরবন্সের মত নূতন ধরণের মল্লের অভ্যুদয় ভারতের পক্ষে শ্লাঘার কথা। তিনি ভারতীয় কুস্তিগীরের সম্মান প্রভূতভাবে বাড়িয়েছেন।

গামা বোধকরি এই বিদেশীদের কোলাহলে উত্ত্যক্ত হয়েছিলেন। তিনি সদলবলে বোম্বাই সহরে এসে এক বিরাট্ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ কুস্তি হয়েছিল, গুঙ্গা-হামিদার। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত কোন ফল নির্ণয় হয়নি। কারণ, হামিদা কিছুক্ষণ লড়ার পর আখাড়া থেকে চলে যায়।

স্বনামধন্য মল্ল
হরবন্স্ সিং

গামা বা ইমামের সঙ্গে লড়বার জন্য ক্রেমার অনেকদিন থেকে ব্যস্ত হয়েছিল। গুঙ্গাকে হারিয়ে ভারতের চ্যাম্পিয়ন ইমামের সঙ্গে লড়বার তার অধিকারও জন্মেছিল ব'লে আমি স্বীকার করি। এক দিন এক বিরাট্ লোকারণ্যের মধ্যে ইমাম-ক্রেমারের সাক্ষাৎ হ'ল এবং প্রৌঢ় ইমাম এই জার্ম্মান জোয়ানকে মাত্র তিরিশ সেকেণ্ডে পরাজিত করলেন। তিনি যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ এ-কথা আবার প্রমাণ হয়ে রইল। ক্রেমারের তরফের লোক ও কোন কোন ইংরেজ চালিত সংবাদপত্র চেঁচামেচি করলে যে, ক্রেমারের সত্যকারের পরাজয় হয়নি। হেরে গেলে এ-কাণ্ডটা প্রায় অধিকাংশ লোকেই ক'রে থাকে।

কিন্তু এই অনর্থক চেঁচামেচি একদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। গামাকে লোকে পঞ্জাব-কেশরী বলে। এই ঊনষাট বছরের বুড়া পহলবান যা প্রচার করলেন, তাতে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভারতে 'এক-লঙোটি' কুস্তির প্রথা আছে। অর্থাৎ কোন মল্লশ্রেষ্ঠ একটা দলের সঙ্গে এই সর্ত্তে লড়তে রাজী হন যে, সমস্ত দলটিকে পরাজয় করবার পূর্ব্বে তিনি আখাড়া ত্যাগ করবেন না। এ ধরণের কুস্তি সেকালে লড়বার ক্ষমতা রাখতেন মল্লশ্রেষ্ঠ গুলাম পহলবান এবং একালে রাখেন, গামা। একটা শতাব্দীতে এরকম কুস্তি একবার হয় কি না সন্দেহ। গামা দু'বার এই কুস্তি লড়বার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউ এই পুরুষসিংহের সম্মুখীন হতে চায়নি।

বোম্বাইতে গামা সর্ত্ত করলেন যে, তিনি পঁচিশজন সাহেবের সঙ্গে 'এক-লঙোটি' প্রথায় যুদ্ধ করবেন। যদি কেউ তাঁকে হারাতে পারে কিংবা তাঁর সঙ্গে সমান সমান হয়, সে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ৫০০০৲ টাকার অধিকারী হবে। কিন্তু সে সাহস কারো দেখা যায়নি।

আঠারো

ইমাম ক্রেমারের যুদ্ধ হয়ে যাবার পর বিদেশী মল্লদের লাফালাফি অনেকটা কমে গেল। তারা ভারতবিজয়ী হবার চেষ্টা ছেড়ে নানা-স্থানে য়ুরোপীয় প্রথার কুস্তির দঙ্গল ক'রে বেড়াতে লাগল। কিছু দেশী মল্লও এসব দঙ্গলে যোগ দিলে, ফলে "গ্রীকো-রোমান", "অল্-ইন্" প্রভৃতি কুস্তির চালও ভারতীয়েরা শিখে নিলে। এই বিদেশী দলে কিং কং জাঁদরেল মল্ল, তার ছবি দেখলেই বোঝা যায়। আমি তাকে এখনো চোখে দেখিনি, কাজেই বলতে পারি না সে কত-বড় যোদ্ধা। কিং কং-এর দৈহিক ওজন অবিশ্বাস্য—চার মণ বাইশ সের। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও তার আকৃতি অনুযায়ী। হরবন্স্ সিং তাকে অনেকবার পরাস্ত করেছেন। কিন্তু আজকাল সংবাদপত্রে দেখি, কখনো কিং কং হরবন্স্‌কে হারায়, কখনো হরবন্স্ জেতেন।

যাই হোক, আমার এই নূতন ধরণের "অল্-ইন্" কুস্তি দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল, আর ক্রেমার ছাড়া অন্য য়ুরোপীয় মল্লদের বিদ্যাবুদ্ধি কতদূর তাও জানবার ইচ্ছা ছিল। একদিন আমার সে ইচ্ছা পূরণ হ'ল।

আমাদের দঙ্গলে সংখ্যায় অনেক না হলেও, কতকগুলি নামজাদা মল্ল এসেছিল। তাদের মধ্যে নিজাম ও ঘোঁসা প্রধান। নিজাম ভারতের মহামল্লদের তালিকাভুক্ত। সে শুধু দেশী কুস্তির ওস্তাদ নয়, বিদেশী সব কুস্তি,—বিশেষ ক'রে "অল্-ইন্" তার জানা আছে। এখানে আসবার কিছুকাল পূর্ব্বে নিজাম পুণা সহরে ক্রেমারের সঙ্গে সমান

সমান লড়েছিল। কিন্তু আমাদের দঙ্গলে আমরা নিজামের উপযুক্ত

মানব হস্তী "কিং কং"

জোড় পেলাম না। দুটো কুস্তি আমরা ঠিক করলাম, নিজাম অবলীলায়

তা জিতে নিলে। তার যে মাপজোপ নিলাম, এ-কথা বলাই বাহুল্য। এই সুদর্শন, শান্ত, অল্পভাষী পহলবানকে আমার বেশ লাগল, কিন্তু তার বিদ্যার সম্যক্ পরিচয় পাবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

ঘোঁসার বিষয়েও সেই কথা বলা চলে। তেইশ বছরের এই শক্তিশালী যুবক, পহলবানীর সব চাল আয়ত্ত করেছে; তার উপযুক্ত প্রতিযোগী আমরা পেলাম না। সকল মল্লই আমাকে তাদের দেহ মাপতে দেয়, কিন্তু ঘোঁসা বুক মাপাবার পরই পালিয়ে গেল। ওর বিশ্বাস, মাপলে ওর দেহে নজর লেগে যাবে ও শক্তি লোপ পাবে। ঘোঁসার ভবিষ্যৎ আমি খুব উজ্জ্বল ব'লে মনে করি। কিছু দিনের মধ্যে ওর নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে।

এই দঙ্গলে তিনজন য়ুরোপীয় মল্ল ছিল—বেবিয়ান, জিবিস্কো ও কন্সট্যান্টাইন। জিবিস্কো বিরাটাকার পোল্যাণ্ডবাসী, অন্য দু'জন রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়ার লোক। কন্সট্যান্টাইনের দেহটি ভারী সুন্দর, বেবিয়ানকেও খুবই সুপুরুষ বলা যায়। বেবিয়ানের সঙ্গে প্রথম দিনে আব্দুল সালামের. কুস্তি হ'ল। ছোট হলেও, সালাম বিশেষ চতুর মল্ল। এদের লড়া দেখবার মত। দু'জনের মুখে হাসি লেগে আছে, অন্যায়ভাবে কেউ কারুকে জব্দ করতে চায় না। বস্তুতঃ, এরা ঠিক কুস্তি লড়েনি, যেন আখাড়ায় প্রতিযোগী পহলবানদের কি-রকম আচরণ হওয়া উচিত তাই দেখিয়ে গেল, যা বড়-একটা দেখা যায় না। আমি যে শ্রেষ্ঠ মল্লের মেডেল দিয়ে থাকি, এই কারণে তা সালামকে দেওয়া হ'ল। এই কুস্তির ফল সমান সমান। পরের দিন বেবিয়ান একটা দাঁও ফস্কে এলাহাবাদের এক পহলবানের কাছে হেরে গেল।

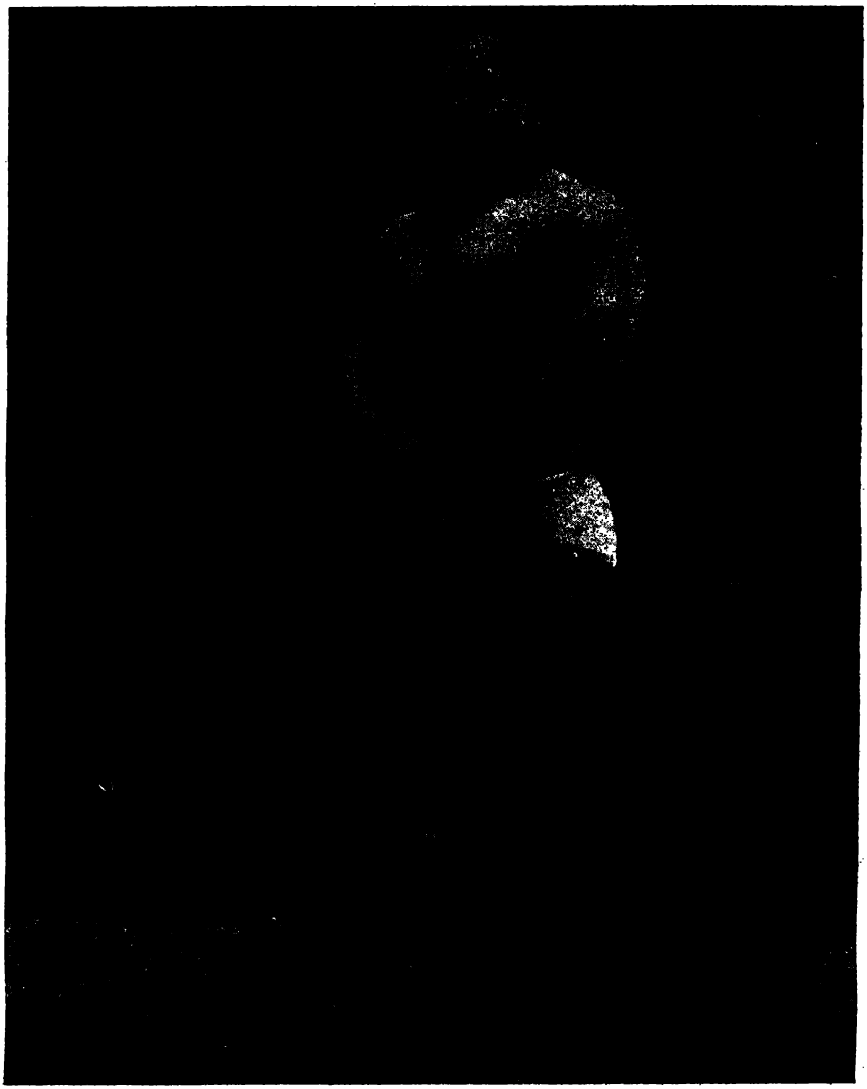

নিজাম

হাজি অদালত নামজাদা হলেও, বুড়ো পহলবান। শরীরে কিছু নেই, কাঁচা-পাকা বাবরী চুল, পান চিবোতে চিবোতে সে কন্সট্যান্-টাইনের সঙ্গে লড়তে এলো। যেন দৈত্য আর একটা ফড়িং! এদেশে 'নাট' ব'লে এক জাতি আছে, হাজি সেই জাতির লোক। লোকে বলে, নাটেরা অপরকে যাদুমন্ত্রে বশ করতে পারে। হাজির কাণ্ড দেখে মনে হ'ল কথাটা সত্যি। আধঘণ্টায় তাকে আয়ত্ত করতে না পেরে শেষে কন্সট্যান্টাইনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হাজি বার বার এই বিদেশীকে নীচে আনে আর কন্সট্যান্টাইন তাকে পিঠে নিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু করতে পারে না কিছুই। হাজি হো-হো ক'রে হাসে, দর্শকদের হাসায় আর তার প্রতিযোগী রেগে আগুন হয়! ফলে কুস্তি সমান সমান হ'ল।

আদ্ধার কথা আগে বলেছি, সেও মক্ক-ফেরৎ হাজি। যুক্ত-প্রদেশের সে শ্রেষ্ঠ মল্ল, কিন্তু মানুষটি এত ক্ষুদ্রকায় যে, তাকে পহলবান ব'লে কেউ স্বীকার করবে না। পরদিন কন্সট্যান্টাইনের সঙ্গে তার কুস্তি হ'ল। আদ্ধার ওজন ১৫০ পাউণ্ড, আর তার বিপক্ষের ওজন ২০৫ পাউণ্ড, কিন্তু আদ্ধা তাকে নাস্তানাবুদ ক'রে তুল্লে। মিনিট-দুই পরে আদ্ধা অত-বড় জোয়ানকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেল্লে, আর ঠিক আট মিনিটের মধ্যে তাকে উল্টে চিৎ ক'রে দিলে।

জিবিস্কোকে ওজন করেছিলাম, তার ওজন ২০৮ পাউণ্ড। সে যে বিশিষ্ট শক্তিমান্ তাতে সন্দেহ নাই। একদিন আমার বাড়ী এসে জিবিস্কো অবলীলায় ২৭০ পাউণ্ড বারবেল নিছক গায়ের জোরে "slow push" করলে। অন্ততঃ আমাদের ভারোত্তোলকদের পক্ষে এটা স্বপ্নাতীত ব্যাপার। যাই হোক, আদ্ধার সঙ্গে ওর যুদ্ধ আরম্ভ

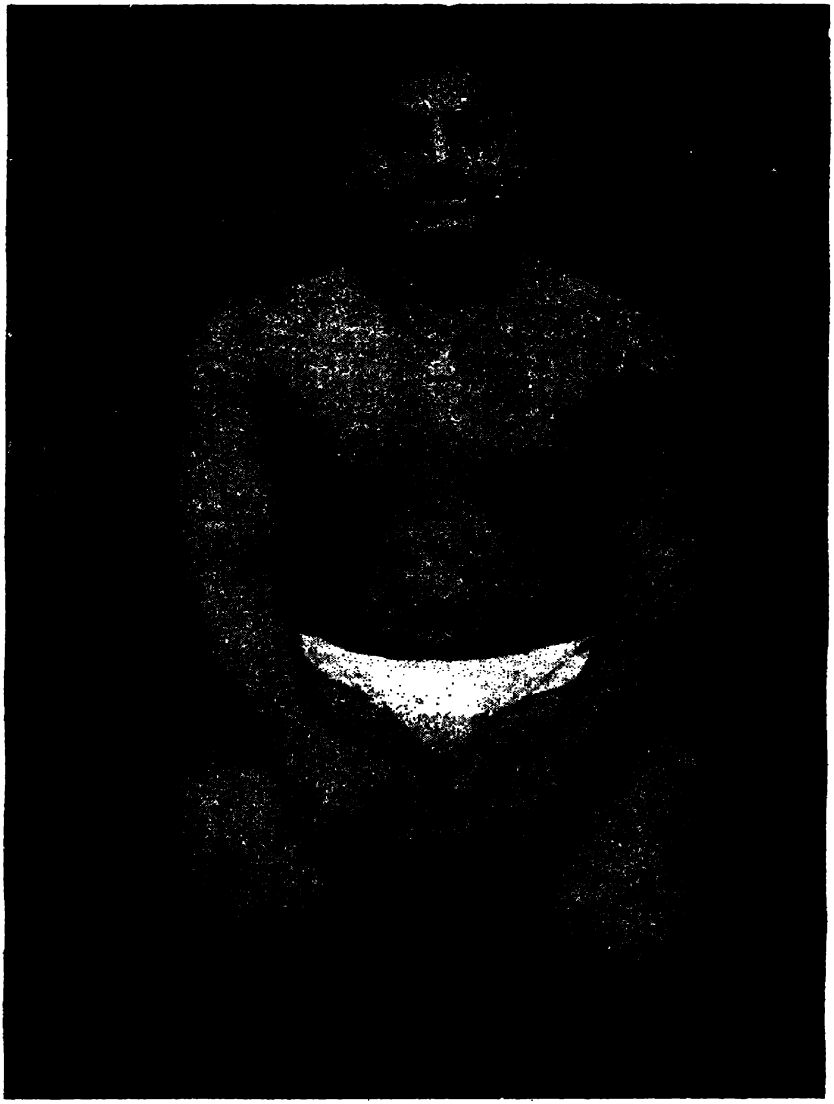

আব্দুল সালাম

১৮৫

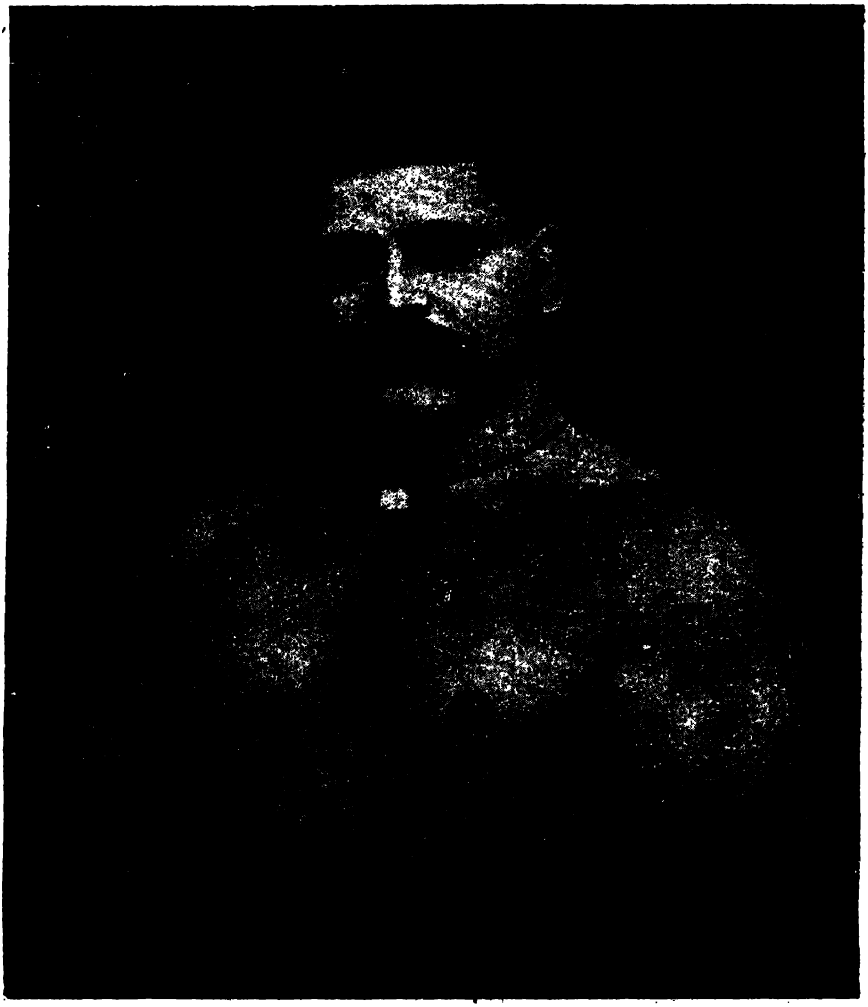

গামা পহলবান

হ'ল। প্রথম মিনিটেই আব্দা ওকে ভূপাতিত করলে। কিছুক্ষণ পরে সে কুস্তি ছেড়ে আব্দাকে ঘুষি মারলে। ফল হ'ল, আব্দা ওকে গোপনে এমন আঘাত করলে যে, কুস্তির নিয়ম তাতে ব্যাহত হ'ল না, কিন্তু জিবিস্কো খানিক ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। কিছু বিশ্রামের পর আবার কুস্তি হ'ল। আব্দা ওকে নীচে এনে ওল্টাবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে জিবিস্কো ওর হাতে কামড়ে দিলে। কাজেই আমি জিবিস্কোকে আখাড়া থেকে বার ক'রে দিতে বাধ্য হলাম। আব্দা এ কুস্তিটাও জিতল।

মেয়েরা যে কুস্তি লড়তে পারে, তা বোধহয় অনেকেই জানে না। এই দঙ্গলে এক মেয়ে পহলবান এলো, তার নাম উম্মীদ বানু, লোকে তাকে হামিদা বানু বলে। হামিদার নাম আমি বহু আগেই শুনেছিলাম, তাকে দেখবারও ইচ্ছা ছিল আমার। আখাড়াতেই তাকে ডেকে পাঠালাম। হৃষ্টপুষ্ট এক মেয়ে, লুঙ্গি ক'রে ধুতি-পরা, গায়ে পুরুষালি কোট, মাথায় গান্ধি টুপি। মুখটি কচি, কিন্তু দেহটি বিরাট।

হামিদা—মৃজাপুরের লোক। ওর বাপ পহলবান ছিল, কাজেই ছোটবেলায় ও খেলার ছলে লড়তে শেখে। মৃজাপুরে পিয়ারী ব'লে একটি হিন্দু মেয়ে ছিল, সেও কুস্তি লড়ত। একদিন রেষারেষি ক'রে দুজনের কুস্তি হ'ল। তারপরে হামিদার বাপ মারা যায়। সংসার চলে কি ক'রে? কাজেই হামিদা পেশাদারী কুস্তিতে ঢুকে পড়ল। ও নিজেই আমাকে বলেছে যে, পাঁচ বছরে ও ২৭,০০০৲ টাকা রোজগার করেছে।

যাই হোক, আমরা ওর কুস্তির ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু যে দুশো

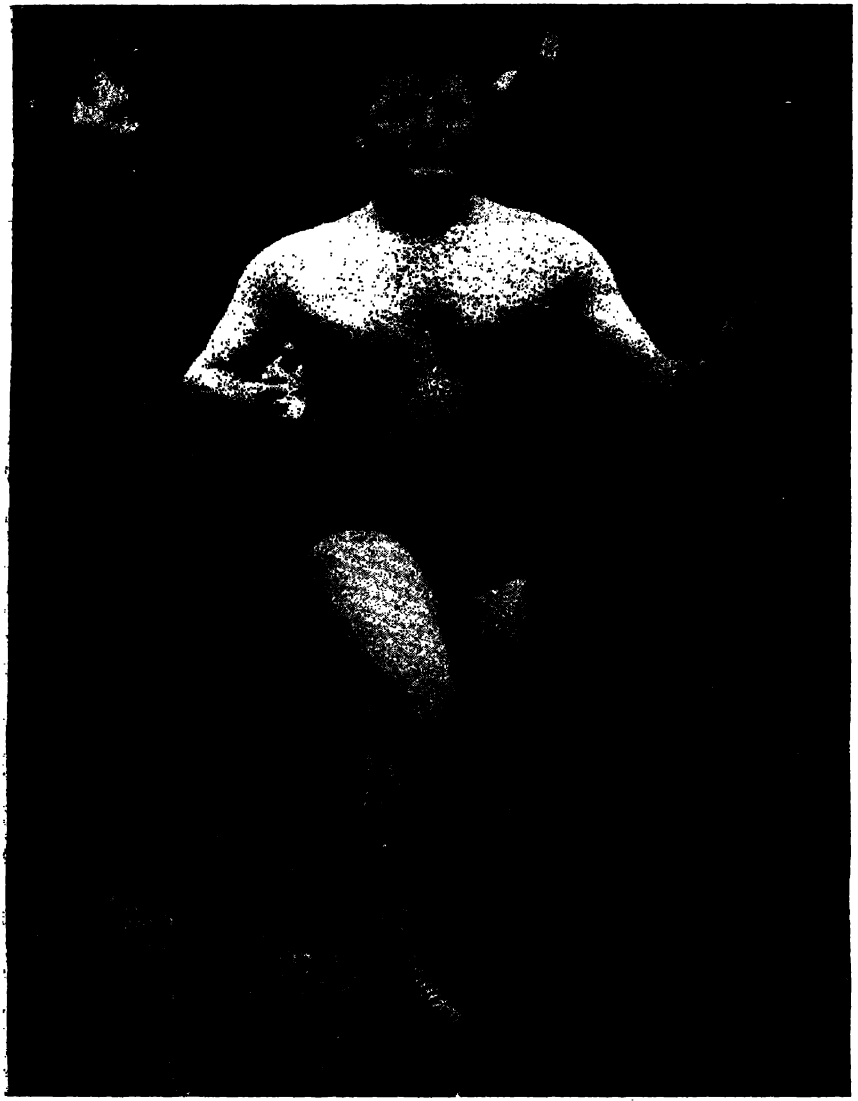

জর্জ কন্সট্যান্টাইন

পহলবান দঙ্গলে উপস্থিত ছিল, কেউ তার সঙ্গে লড়তে রাজী হয় না, স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়ে কে মর্য্যাদা হারাবে! হাজী অদালত ব'ল্লে, আমি লড়ব। আগেও ওরা অন্যস্থানে লড়েছিল। কিন্তু সেটা হকে 'নূরী' অথবা মেলা কুস্তি; কাজেই আমরা অন্য লোক খুঁজতে লাগলাম। শেষে পয়সার লোভে লাহোরের এক ছোকরা তার সঙ্গে লড়তে রাজী হ'ল।

পরদিন আখাড়ায় লোক ধরে না। এমন কি, কিছু ভদ্রমহিলা এ অভাবনীয় ব্যাপার দেখতে এলেন। হামিদা মোটা সাঁতারের পোষাক প'রে আখাড়ায় নামল। আমি আশ্চর্য্য হলাম দেখে যে, হামিদা প্রতিপক্ষকে ধরবামাত্র চমৎকারভাবে 'ঢাক' মেরে নীচে নিয়ে এলো। কিন্তু একজন বলবান যুবককে কতক্ষণই-বা এ-রকম ক'রে একজন স্ত্রীলোক ধ'রে রাখতে পারে! ওর প্রতিদ্বন্দ্বী মিনিট-চারেক পরে ওপরে এসে হামিদাকে চিৎ করবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু হামিদা দেহ প্রসারিত ক'রে শুয়ে প'ড়ে সে চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিলে। শেষে বেগতিক দেখে হামিদা করলে কি জান? ছোকরা-টির হাত কামড়ে দিলে। দাঁও-প্যাঁচ শিখলে কি হয়, শেষে নারীসুলভ পুরোনো প্যাঁচই ওর কাজে লাগল! হামিদার নাম বজায় রাখবার জন্য কুস্তি সমান-সমান ব'লে ছাড়িয়ে দিলাম।

রাত্রে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকটি এসে আমাদের ধরলে—হুজুর, হামিদার সঙ্গে লড়েছি, লোকে আমাকে ছি ছি করছে। কোন জওআনের সঙ্গে লড়িয়ে আমার মান বাঁচান। তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। কাজেই পরদিন তাকে আবার লড়তে দেওয়া হ'ল। হামিদা বানু একটা বাজে লোককে তুলে আছাড় মারেনি। কারণ,

পোলিশ কুস্তিগীর

জিবিস্কো ম্যালিনোভিচ্

সেদিন সেই ছোকরা যা লড়লে, তাতে দঙ্গলের মধ্যে তার কুস্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল।

ভারতের বৃহত্তর কুস্তির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হ'ল। গামার শিষ্য হামিদা পহলবান, গুঙ্গাকে কখনো জয় করতে পারেনি।

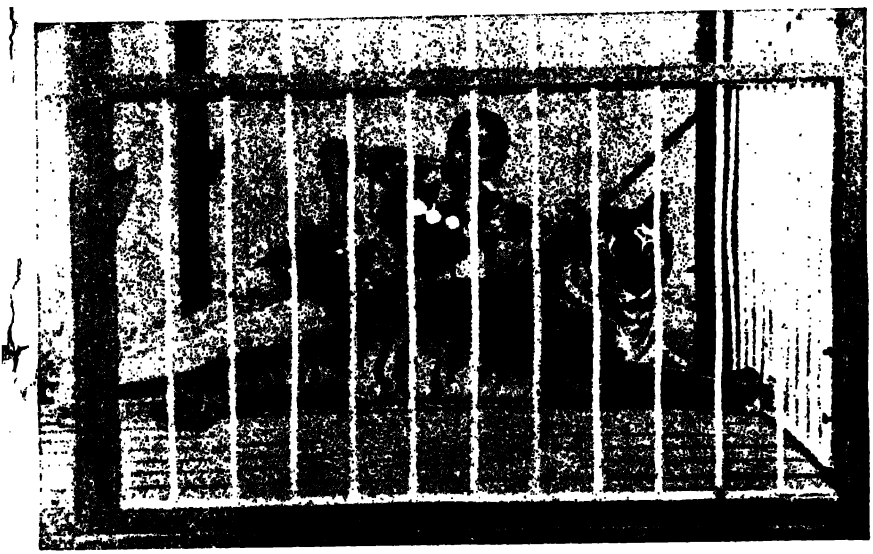

সেকালের নারী ব্যায়ামী
সুশীলা সুন্দরী

ভাওয়ালপুর দরবারের কৃপায় ওদের আবার কুস্তি হ'ল। প্রথম দিন কিছুক্ষণ লড়ার পর কোন ফল নির্ণয় হ'ল না, পরদিন কুস্তি আরম্ভ হবার পর গুঙ্গা আখাড়া ছেড়ে পালালো, হামিদাকে জয়ী সাব্যস্ত করা হ'ল। সেদিনও অমৃতসরে এই দুই মল্লবীরের "শাহী" কুস্তি হয়ে

গেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধের মত বড় পহলবানের কুস্তিকে "শাহী" কুস্তি ব'লে। তাতেও গুঙ্গা আখাড়া পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে। ফলে এই হ'ল, হামিদার স্থান এখন ইমাম পহলবানের নীচে। ইমামের পর হামিদা বিনা ক্লেশে রুস্তম্-ই-হিন্দ্ হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমামের বয়স হলেও, অবসর নেবার কারণ হয়েছে কি? ক্রেমারের ভক্তেরা যেমন একদিন বলত যে, ক্রেমার ইমামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তেমনি হরবন্স্ সিংএর ভক্তেরা বলতে আরম্ভ করেছিল যে, ইমামকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন হরবন্স্। ইমাম কিছুদিন আগে ক্রেমারের সব দাবী মিটিয়ে দিয়েছেন। তারপর বোম্বাই শহরে হরবন্স্ সিংকে মাত্র তিন মিনিটে পরাজিত ক'রে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী এখনো জন্মায়নি।

অল্-ইন্ কুস্তির কথা বলি। একদিন আমি জিবিস্কো আর নিজামকে অল্-ইন্ দেখাতে অনুরোধ করলাম। কুস্তি আমি তাকে বলব না, সেটা কুস্তির জগা-খিচুড়ি। খানিকটা জুড়ো, অর্থাৎ জাপানী কুস্তি, খানিকটা দেশী, খানিকটা বিলিতি। তার ওপর লাথি মারা ইত্যাদি ত' আছেই। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হ'ল, Drop kick; একজন লাফিয়ে উঠে বিপক্ষের বুকে বা মুখে জোড়-পায়ে লাথি মেরে তাকে ভূপাতিত করে। তবে "অল্-ইন্" লড়া যার-তার কর্ম্ম নয়, সত্যিকারের মজবুত আর সাহসী মানুষ না হ'লে "অল্-ইন্" লড়তে পারে না। নিজামকে কিন্তু এই বিদেশী ধারাতেও জিবিস্কোর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ব'লে মনে হ'ল।